সদানন্দের বৈরাগ্য

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি
১৪।১বি ভুবনমোহন সরকার লেন
কলিকাতা

আশ্বিন ১৩৪২

দুই টাকা

প্রকাশক—
শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগ্‌চি
১৪।১ বি, ভুবনমোহন সরকার লেন
কলিকাতা

প্রিণ্টার—
শ্রীমিহিরচন্দ্র ঘোষ
নিউ সরস্বতী প্রেস
২৫।৩এ শম্ভু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সদানন্দের বৈরাগ্য

পৃষ্ঠা

বাপ-মায়ে বড় সাধ করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল সদানন্দ। পাড়ার দুষ্টলোকেরা তাঁহাদের স্নেহের ভুলটাকে সংশোধন করিয়া তাহাকে নিরানন্দ বলিত।

সে ছেলেবেলা হইতেই কেমন অনাবশ্যক গম্ভীর। শৈশবে সে 'তাই তাই' করিয়া হাসে নাই। বাল্যে পাঠশালায় গিয়া চঞ্চলতা প্রকাশ করে নাই। এজন্য তাহার সহপাঠীরা তাহাকে গুরুমশায় বলিত। এখন সদানন্দ যৌবনপথের অনেকখানি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, এখন ত তাহার না হাসিবারই কথা।

সদানন্দ হাসে নাই, কিন্তু তাহার যথারীতি বিবাহ হইয়াছে; এবং গুটিকত কলকাকলিতে তাহার গৃহ মুখর হইয়া উঠিতেছে।

এইসব ব্যাপারগুলা সদানন্দের জীবনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাইতেছিল না। প্রথম, বিবাহ ব্যাপারটাই তাহার

গাম্ভীর্য্যের প্রতি নিষ্ঠুর উপহাস—বাপ-মায়ের দারুণ ষড়যন্ত্র। ছাদনাতলায় শালা-শালীতে কান মলিয়া, বাসরঘরে বিদ্রূপ করিয়া, কথায় কথায় ঠকাইয়া সদানন্দের গাম্ভীর্য্যকে টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছিল।

স্ত্রীটি ত অপরিবর্জ্জনীয় উপদ্রব। খাও দাও থাক; তা না, তাঁহার আবার সখ কত! হাসি চাই, ঠাট্টা চাই, রসিকতা চাই। সদানন্দের প্রাণ এই এক কোথাকার-কে -উড়িয়া-আসিয়া-জুড়িয়া-বসা অত্যাচারীর উৎপাতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল। বেচারার বারবার মনে হইত—

"স্ত্রীর চাইতে কুমীর ভালো
বলে সর্ব্ব শাস্ত্রী।
কুমীর ধর্‌লে ছাড়ে তবু,
ধর্‌লে ছাড়ে না স্ত্রী।"

বিবাহের ছুচার বছর পরেই স্ত্রীটি নূতনতর উপদ্রবের পন্থা আবিষ্কার করিল। বছরে একটি করিয়া শিশুর আমদানীতে ঘর ভরিয়া ফেলিবার উপক্রম! শুধু কি তাই! শুধু তাই হইলেও ত সদানন্দ বাঁচিত। শিশুগুলা আবার হাসে! তাহারা নাচে, গায়, বত্রিশ রকম মুখভঙ্গী করে,

সদানন্দের ভীষণ গম্ভীর শ্মশ্রুবহুল মুখ দেখিয়া একটুও ভয় করে না, বরং তাহাদের আক্রোশ তাহার দাড়ির উপরেই অধিক। এইসব দেখিয়া শুনিয়া সদানন্দের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

গাঁয়ের লোকেরাও কি কম উৎপাত করে। তাহারা সদানন্দের অমন গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র খাতির না করিয়া কেহ বা তাহার মাথায় চাঁটি মারে, কেহ বা গায়ে হুঁকার জল ঢালিয়া দেয়, কেহ বা তাহার দাড়ি ধরিয়া টানে।

বাল্যাবধি লোকের অভদ্র উৎপাতে সদানন্দ মনে মনে ভারি বিরক্ত হইতেছিল। ক্রমে তাহার গৃহ যখন পাঁচ ছয়টি শিশুর ক্রন্দনে কোলাহলে আব্‌দারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তখন একদিন সদানন্দ "ধুত্তোর" বলিয়া গৃহ ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

সে গৃহ ছাড়িল, অদৃষ্ট কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না।

সদানন্দ চায় বেশ একটি নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে সে আপনাকে লইয়া গুম হইয়া জীবনটা কাটাইয়া দেয়। তাহার ভাগ্য-বিধাতা কিন্তু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন অন্যরূপ। দূর হইতে পর্ব্বতের গুহা, গহন বন মনের মধ্যে বেশ একটা বিরাট

রকমের ভাবসঞ্চার করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সেগুলার মধ্যে কবিত্বের অংশটা খুঁজিয়া পাওয় দুষ্কর। গুহার মধ্যে কাঁকর বা বনের মধ্যে ফলপাকড় খাইয়া ত জীবনটাকে অধিক দিন ঠেকাইয়া রাখা যায় না। ক্ষুধা জিনিষটা সদানন্দের অতবড় গাম্ভীর্য্যকে যে একেবারেই ভয় করিত না।

সুতরাং সদানন্দকে লোকালয় ঘেঁসিয়াই এক গ্রামের সুদূর প্রান্তে একখানা কুঁড়ে বাঁধিতে হইল। আঃ! সেখানেও কি কম জ্বালাতন! হাটের ব্যাপারী লোকগুলা তাহারই কুটীরে গিয়া তামাক খাইবার আগুন চায়, কৃষকেরা গান গাহিয়া শান্তি ভঙ্গ করে, ভবঘুরে ছেলেগুলো মরিবার আর জায়গা না পাইয়া তাহারই কুটীরের চারিদিকে ঘুরপাক খায়!

আহারের সঞ্চয়ের জন্য মাঝে মাঝে তাহাকেও গ্রামে ঢুকিতে হয়। সেখানেও কি যত জঞ্জাল! গ্রামের কুকুর-গুলা খেউ খেউ করিয়া তাহাকে নাচাইয়া তুলে, ছেলেগুলা সেই সঙ্গে হাততালি দিয়া ক্ষেপাইয়া দেয়, মেয়েরা পর্য্যন্ত ঘোমটার আড়াল হইতে সন্ন্যাসী মিনুসের নাকাল দেখিয়া

কটাক্ষ হানিয়া মুচ্‌কি হাসে—অত বড় গাম্ভীর্য্যটাকে একটুও গ্রাহ্য না করিয়া সকলে মিলিয়া একেবারে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলে।

সদানন্দের সে গ্রামে আর বাস করা পোষাইল না। সে খুঁজিয়া খুঁজিয়া এক গ্রামের বাহিরে তেপান্তর মাঠে শ্মশানের মাঝে আপনার আস্তানা গাড়িল।

শ্মশানডাঙায় কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে আসিত না। কালেভদ্রে শব-সঙ্গীরা তাহার কুটীরে আশ্রয় লইত, প্রতিদানে যাহা দিয়া যাইত সদানন্দের তাহাতেই কোনো রকমে দিন-গত পাপ-ক্ষয় হইত।

এখানে সদানন্দ এক রকম মনের সুখেই নিশ্চিন্ত ছিল। বেচারার ভাগ্যবিধাতা কিন্তু তখনো নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

একদিন কয়েকজন লোক একটি শব সৎকার করিতে শ্মশানে আসিয়াছে। ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহারা তাড়াতাড়ি শবটাকে আনিয়া সদানন্দের কুটীরের বাহিরে রাখিল এবং অভ্যর্থনার অপেক্ষা না করিয়াই সদানন্দের কুটীরের মধ্যে ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িল।

ছোট কুটীর। তাহার মধ্যে পাঁচ-ছয়জন লোক ঢুকিয়া

জটল্লা কলরব আরম্ভ করিয়া দিল। সদানন্দের তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তাহার উপর তাহারা তামাকের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাইয়া সদানন্দ বেচারাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সদানন্দ আস্তে আস্তে পাশ কাটাইয়া কুটীরের দ্বারের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুষল-ধারে বৃষ্টি হইতেছে। শব বাহিরে পড়িয়া ভিজিতেছে, সদানন্দ তাহাই দেখিতেছে। হঠাৎ তাহার মনে হইল, শব যেন একটু নড়িল। দানায় পাইল না কি!

সদানন্দ ভয়ের বড় একটা তোয়াক্কা রাখিত না, রাখিলে কি শ্মশান আপনার বাসস্থান বলিয়া বাছিয়া লইতে পারে? সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রোমবহুল ঝাঁপালো ভ্রূর তলদেশ হইতে চক্ষু চাড়িয়া দেখিতে লাগিল বাস্তবিকই শব নড়িতেছে। যাহারা শব আনিয়াছিল তাহারা ঘরের ভিতরে আপন মনে ধূমপানে ও গল্পজল্পনায় মত্ত ছিল আর সদানন্দ ছিল দ্বার আগুলিয়া; তাহারা বাহিরের ব্যাপার কিছুই জানিতেছিল না।

সদানন্দ যখন দেখিল যে শব স্পষ্টই নড়িতেছে, তখন

সে কুটীর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শববাহী একজন বলিল, "কি ঠাকুর, জলে ভিজে কোথায় যাও?"

সদানন্দ কোনো উত্তর দিল না। শবের কাছে গিয়া মুখের ঢাকা খুলিয়া ফেলিল। শব তখন চক্ষু মেলিয়াছে, আর বৃষ্টিধারা হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া পান করিতেছে। সদানন্দ শবের ম্যাচ্কা ধরিয়া হড় হড় করিয়া কুটীরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। শববাহীরা কোলাহল করিয়া আপত্তির স্বরে বলিল, "ওকি ঠাকুর, ওটাকে আবার এর মধ্যে ভরছ কেন?"

সদানন্দ এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া শবের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, শব চেতনা লাভ করিয়া উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে। সকলে ভয়ে বিস্ময়ে অবাক আড়ষ্ট হইয়া গেল। সন্ন্যাসীবাবা সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার পুণ্যস্পর্শে মৃত শব সঞ্জীবিত হয়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তাহাদের রোমাঞ্চ হইল। সকলে ভক্তিভরে মহাপুরুষের পায়ের ধূলা মাথায় লইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রামে রাষ্ট হইয়া গেল সন্ন্যাসী মরা মানুষ বাঁচাইতে পারেন। গাঁ ভাঙিয়া রাজ্যের নরনারী

আবালবৃদ্ধবনিতা সদানন্দের কুটীর ঘিরিয়া ভিড় জমাইয়া তুলিল। পীড়িতের আত্মীয়-স্বজন সভক্তি কৃতজ্ঞতায় সদানন্দের চরণে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সদানন্দের খ্যাতি দাবানলের মতো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। প্রতিদিন কত দেশের বাসি মড়া, গলিত কুষ্ঠ আসিয়া তাহার দ্বারে ধন্না দিতে লাগিল। শ্মশানডাঙায় মেলা বসিল, দোকান পসার হাটে জমজমাট! কত দেশের কত লোক কত রকম মানসিক করিয়া সন্ন্যাসী-বাবার চরণে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সদানন্দের কোনো পুরুষে কেহ বৈদ্য ছিল না, অথচ বেচারাকে ঘিরিয়া দুনিয়ার রোগীর সনির্ব্বন্ধ করুণ প্রার্থনা দিবানিশি ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সদানন্দ যত সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করে যে তাহার বাস্তবিক কোনো দৈব ক্ষমতা নাই, সে সিদ্ধপুরুষ বা যোগী মোটেই নহে, সে একজন অতি সাধারণ রকমের সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী, লোকের ভক্তি আগ্রহ ততই বাড়িয়া চলে। সকলে বলাবলি করে, "দেখেছ, বাবাঠাকুরের মহিমে! আজকালকার দিনে লোকে পসার জমাবার জন্যে কি না

করে? কিন্তু বাবা খাঁটি মহাপুরুষ কিনা, তাই ধরা দিতে চান না। কিন্তু বাবা ধরা ত পড়েছ, ভক্তকে ভাঁড়াতে আর পারছ না। তোমাকে ওষুধ দিতেই হবে। যতদিন ওষুধ না পাব শ্রীচরণ আঁকড়ে পড়ে থাক্‌ব। দয়া তোমাকে কর্‌তেই হবে বাবা!"

শ্রীচরণ দুখানিকে অসংখ্য ভক্তের সাগ্রহ আক্রমণের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য নাচার হইয়া সদানন্দ হাতের মাথায় যাহা পায় তাহাই ঔষধ বলিয়া বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল। আর সকলে তাহাই ভক্তিভরে সেবন করিতে কিংবা মাদুলী করিয়া ধারণ করিতে লাগিল। অনেকের রোগ বিশ্বাসের জোরেই সারিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীবাবার খ্যাতি প্রতিপত্তিও বাড়িয়াই চলিল। যাহাদের রোগ সারিল না তাহারা দ্বিগুণ আগ্রহে সদানন্দের চরণ চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "হে বাবাঠাকুর, কি পাপ দেখে আমার উপর দয়া হল না বাবা!"

সদানন্দ বেচারা ভক্তির আতিশয্যে উত্যক্ত হইয়া উঠিল। সে সংসার ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া

বিশ্ববিধাতা আজ সারা সংসার ডাকিয়া তাহারই কুটীর-দ্বারে আনিয়া হাজির করিয়াছেন! এ কী ভীষণ শাস্তি! সদানন্দ দেখিল এর চেয়ে সে নিজের গ্রামে নিজের গৃহে ঢের শান্তিতে, ঢের আরামে ছিল। অবশেষে তাহার বৈরাগ্যের উপর বৈরাগ্য আসিল:

একদিন সকালে সকলে সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিল—বাবা সিদ্ধপুরুষ অন্তর্ধান করিয়াছেন। সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। সিদ্ধপুরুষের অন্তর্ধানে সরগরম শ্মশান-ডাঙা ক্রমে ক্রমে আবার শ্মশান হইয়া গেল।

বরপণ

১

মহেশবাবুর একমাত্র পুত্র সতীশ যখন এম-এ পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইল তখন মহেশবাবু পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঘটকেরা কত মেয়ের সংবাদ লইয়া আসে, মহেশবাবু কত মেয়ে দেখিলেন, কিন্তু কোনোটিকেই তাঁহার আর পছন্দ হয় না। ছেলে তাঁহার এম-এ পাশ করিয়া হাকিম হইয়াছে, তাহার যোগ্য মেয়ে হওয়া চাই ত। মেয়েটি প্রথমত নিখুঁত সুন্দরী হইবে, নতুবা ছেলের মনে ধরিবে কেন? তাহার বেশ লেখাপড়া জানা চাই, নতুবা সে এম-এ পাশ করা হাকিম স্বামীর মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে কেন?

তাহার পিতার মেয়েকে গা-ভরা অলঙ্কার এবং অন্তত পক্ষে হাজার পাঁচেক টাকা বরপণ দিবার সঙ্গতি

থাকা চাই, নতুবা তাঁহার পুত্রের বিদ্যার উপযুক্ত সম্মান হইবে কেন?

এমন রাজযোটক মেয়ে শীঘ্র মেলা দুষ্কর; সুন্দরী হয় ত লেখাপড়া জানে না; লেখাপড়া-জানা সুন্দরী হয় ত তাহার বাপ গা-ভরা অলঙ্কার এবং পাঁচ হাজার টাকা পণের দাবী শুনিয়া পিছাইয়া যায়।

সতীশ একদিন আস্তে আস্তে পিতার কাছে আসিয়া বলিল—"বাবা, বিয়েতে পণ টন কিছু নিয়ো না।"

মহেশবাবু অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন?"

সতীশ লজ্জিত সম্ভ্রমে মাথা নত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"পণ নেওয়ার মানে ত ছেলে বেচা!"

মহেশবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"যা যা, আর জ্যাঠামি করতে হবে না! বেচা ত বেচা! তোর ওপরে ত আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তোকে আমি বেচেই টাকা নেবো। তোকে পড়াতে যে এক গঙ্গা টাকা জলের মতন খরচ হয়ে গেছে, সে আমি আদায় করে নেবো না! চিরটা কাল পণ নেওয়া চলে আসছে আমাদের

কুলিনের, এখন উনি দুপাতা ইংরিজি পড়ে বাপপিতমর চাল সব একদিনে পাল্টে দেবেন ! তোর সঙ্গে শুধু বিয়ে করার সম্বন্ধ। যেদিন বলব, টোপর পরে' বাপের সুপুত্তুর হয়ে বিয়ে করতে যাবি। আর কোনো কথা আমি তোর শুনতে চাইনে।”

সতীশ মাথা নত করিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

তাহার বন্ধুরা তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল—“কি হে সমাজ-সংস্কারক ভায়া! লম্বা লম্বা বক্তৃতা করে' শেষে রাতারাতি পাঁচহাজারী মনসবদার হবার চেষ্টা! বক্তৃতার চেয়ে দৃষ্টান্ত ভালো—লোকে বলে। দৃষ্টান্তের বেলায় পঞ্চ হাজার, বক্তৃতাতেও বাক্য দেদার!”

সতীশ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া বলে—“কি করব বল! বাবার ওপরে ত আমি কথা বলতে পারিনে। আমার যখন ছেলে হবে তখন আমি কথায় কাজে মিল থাকে কিনা দেখিয়ে দেবো।

সকলে তাহাকে পিতৃভক্ত রামচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়া দস্তুর-মতো লাঞ্ছনা করিতে লাগিল।

কিন্তু সতীশ পিতাকে আর কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার মা মারা যাওয়ার পর পিতা যে কি কষ্টে তাহাকে মানুষ করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন তাহা ত সে জানে। বাহিরের লোক ঠিক বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু তাহার উপর তাহার পিতার যে ষোল আনা স্বত্ব আছে তাহা সে কেমন করিয়া অস্বীকার করিবে? তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে তাহার মায়ের সমস্ত গহনা একে একে বন্ধক পড়িয়াছে, প্রায় দু হাজার টাকা তাহার পিতার ঋণ। তিনি যদি পুত্রকে বিক্রয় করিয়াও ঋণমুক্ত হইতে চাহেন তবে তাহার আপত্তি করা শোভা পায় না। সতীশ নীরবে বন্ধুদের সকল বিদ্রূপ সহ্য করিতে লাগিল।

অনেক অনুসন্ধানের পর মহেশবাবুর মনের মতন একটি মেয়ে মিলিল। তাহারই সহিত সতীশের বিবাহ দেওয়া স্থির হইয়া গেল।

২

বিবাহের পরদিন সতীশের শ্বশুরবাড়ীতে মেয়ে জামাই বিদায় করিবার ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু সতীশের বাড়ী যাইবার জন্য কোনো রকম ইচ্ছা বা উদ্যোগ প্রকাশ

পাইতেছিল না—সে চুপ করিয়া এক জায়গায় বসিয়াই ছিল।

পাল্কিতে বৌ তুলিয়া মহেশবাবু চীৎকার করিতে লাগিলেন—"সতীশ, সতীশ কৈ?"

সতীশকে কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না। সতীশকে খুঁজিতে চারিদিকে লোক ছুটিল। দেখিল সতীশ বিছানায় শুইয়া পায়ের উপর পা চড়াইয়া দিব্য নিশ্চিন্তভাবে পা নাড়াইতেছে—যাহারা তাহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে যেন বলিতেছিল, না, না, না।

তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার শ্বশুর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাবা, অসুখ বিসুখ কিছু করেনি ত?"

সতীশ উঠিয়া বসিয়া বলিল—"আজ্ঞে না।"

শ্বশুর বলিলেন—"তবে এস, তোমার বাবা তোমায় ডাকছেন।"

সতীশ দিব্য প্রশান্ত সহজ ভাবেই বলিল—"তাঁকে বলুন গে আমি ত এখন বাড়ী যেতে পারছিনে। আমার কিছুদিন এখন এখানেই থাকতে হবে।"

এই কথা শুনিয়া সতীশের শ্বশুর মনে করিলেন জামাই ও বেহাই দুজনে কিছু ঝগড়া-ঝাটি হইয়া থাকিবে বোধ হয়। তাই তিনি জামাতাকে আর কিছু না বলিয়া বেহাইকে গিয়া বলিলেন—"বেয়াই মশায়, সতীশ বলছে সে এখন বাড়ী যেতে পারবে না।"

মহেশবাবু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ?"

সতীশের শ্বশুর বলিলেন—"কেন, তা ত জানিনে, জিজ্ঞাসাও করলুম না। মনে করলুম হয় ত আপনার সঙ্গে কোনো রকম ঝগড়া-টগড়া করে' অভিমান করেছে ; তাই আপনাকে বলতে এলুম।"

মহেশবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"ঝগড়া ? না ! আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার মতন ছেলে ত সে নয়। কি হয়েছে চলুন ত দেখি। কোথায় সে ?"

মহেশবাবু বৈবাহিকের সঙ্গে সতীশের নিকট আসিয়া বলিলেন—"সতীশ, বৌমা পাল্কীতে বসে রয়েছেন, আর তুই এখানে বসে রয়েছিস ? রকম কি ! বাড়ী চ।"

সতীশ বলিল—"আমি ত এখন কিছুদিন বাড়ী যেতে

পারছিনে বাবা। তুমি তোমার বউ নিয়ে বাড়ী যাও, আমি কিছুদিন পরে যাব।"

মহেশবাবু অতিমাত্রায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"কিছু-দিন পরে যাবি কি? হয়েছে কি তোর?"

সতীশ মাথা নত করিয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল—"আমি এঁদের ক্রীতদাস হয়েছি—তুমি ত আমায় পাঁচ হাজার টাকায় এঁদের বেচে গেলে। আমি রোজগার করে' এঁদের পাঁচ হাজার টাকা সুদ সমেত শোধ করব আগে; তারপর এঁরা আমাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলে আমি তোমার কাছে ফিরে যাব! তার আগে ত আমার যাবার জো নেই।"

মহেশবাবু অবাক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; সতীশের কথা শুনিয়া তাহার শ্বশুরের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। মহেশবাবু মনে মনে একবার কল্পনা করিলেন তাঁহার সেই নিরানন্দ নির্জ্জন পুরী—সেখানে তাঁহার পত্নী নাই, সতীশ নাই, একা তিনি আর তাঁহার বৌমাটি! এই বালিকা বধূকে যত্ন করিবার ও সঙ্গ দিবার কেহ নাই, তাঁহার সতীশ পরের বাড়ীতে দাসত্ব স্বীকার

করিয়া খাটিয়া খাটিয়া মাসে মাসে অল্পে অল্পে তাহার পণের ঋণ শোধ করিতেছে! মহেশবাবুর মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল—দুঃখে ক্ষোভে তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। একবার সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি সতীশের শ্বশুরকে পাঁচ হাজার টাকার তোড়া ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—"বেয়াই মশায়, আপনার টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন, সতীশকে আমার সঙ্গে বাড়ী যেতে অনুমতি করুন!"

———

সতীন

অনেক ঠাকুরের দুয়ার ধরিয়া, হাতে-কোলে পূজা দিবার মানত করিয়া, মাদুলি কবচ ধারণ করিয়া, ঔষধ খাইয়া নৃত্যকালীর যখন কিছুতেই একটি ছেলে হইল না, তখন সে জেদ করিয়া নিজে দেখিয়া শুনিয়া স্বামীর আর-একটি বিবাহ দিল। একটি ছেলে না হইলে কি ঘর সংসার মানায়!

স্ত্রীলোক যখন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে তখন সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। আজ বাইশ বৎসর যে স্বামী তাহার ছিল, যাহার জীবনের সহিত তাহার সুখ দুঃখ জড়াইয়া গিয়াছিল, সেই স্বামীকে নৃত্যকালী হাসিমুখে প্রশান্ত মনে তরঙ্গিণীকে দান করিয়া, সেই নবীন দম্পতির সেবা ও যত্নের ভার গ্রহণ করিল। নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে ছোট বোন্‌টীর মতন যত্ন করে, সখীর মতো তরঙ্গিণীকে প্রণয়ের দীক্ষা দেয়, নবযৌবনা তরঙ্গিণীর বৃদ্ধ স্বামীকে

লইয়া রঙ্গ রসিকতা করে, তাহাদের দুজনের নূতন প্রণয়ের ভাবলীলা ও কুণ্ঠিত গোপন মিলন-প্রয়াস দেখিয়া কৌতুক ও আনন্দ অনুভব করে।

তরঙ্গিণীও বাপের বাড়ী হইতে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া দিদির যত্ন মমতায় একদিনের তরেও মুখ মলিন করিবার অবসর পায় নাই। সে খাইতে না চাহিলেও নৃত্যকালী তাহাকে "দিদি আমার, বোনটি আমার, লক্ষ্মী আমার" বলিয়া সাধিয়া সাধিয়া বার বার বিবিধ সামগ্রী খাওয়ায়; সে সাজিতে না চাহিলেও দিদি তাহার নিজের হাতে বিচিত্র বস্ত্র অলঙ্কারে দিনের মধ্যে তাহাকে পাঁচবার পাঁচ রকম করিয়া সাজায়; নৃত্যকালী নিজের হাতে বিবিধ ছাঁদের চুল বাঁধিয়া, টিপ কাটিয়া, আলতা পরাইয়া, তরঙ্গিণীকে জেদ করিয়া জোর করিয়া দিনের মধ্যে পাঁচবার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দেয়।

সংসারের এতটুকু কাজও তরঙ্গিণীকে করিতে হয় না। সংসারের সমস্ত সেবা ও কর্ম্মের ভার নৃত্যকালীর; হাসি আনন্দ ও সম্ভোগের জন্যই যেন তরঙ্গিণীর জীবন।

তাহার পর যখন তরঙ্গিণীর সন্তান-সম্ভাবনা হইল তখন

নৃত্যকালী যেন কৃতার্থ হইয়া গেল। তাহার এত দিনের সাধ এইবার তরঙ্গিণী হইতে পূর্ণ হইবে। সে একটি সোণার চাঁদ কোলে পাইবে। তাহার ঘর সংসার উহার হাসিতে আলো হইয়া উঠিবে। তরঙ্গিণীকে নৃত্যকালী এখন চোখে হারায়, সদাই তাহাকে সাবধান করিয়া রাখে, অনুক্ষণ তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সে টিকটিক করিয়া বেড়ায়, কোনো মতে যেন কিছু অনাচার না হয়, কাহারো ছোঁয়াচ নজর না লাগে ; সু-ভালাভালি দুজন দুঠাঁই হইয়া গেলে সে বাঁচে। তরঙ্গিণী সন্ধ্যাবেলা মাথার ঘোমটা খুলিয়া থাকিলে বা এ-ঘর ওঘর করিবার সময় মাথায় একটা খড়কুটা গুঁজিয়া না রাখিলে তাহাও নৃত্যকালীর নজর এড়ায় না, সে তরঙ্গিণীকে বলে—পেটের কাঁটাটা আমার কোলে একবার ফেলে দে, তারপর তোর যা খুসি তাই করিস্‌, আমি আর তোকে তখন কিছু বলব না।

যেদিন তরঙ্গিণী প্রসববেদনায় কাতর হইয়া নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দিদি, আর আমি বাঁচব না।—সেদিন নৃত্যকালীও সুখে ও দুঃখে তাহার সহিত কাঁদিয়া ফেলিল। এই বেদনার ভিতর দিয়া

তাহাদের উভয়ের মাতৃত্ব আজ পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে।

তরঙ্গিণীর একটি পুত্রসন্তান হইল। নৃত্যকালী সেই আঁতুড় ঘরেই একরাশ করবীফুলের মতো শাদা ধবধবে খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া অশ্রু-সজল হাসিমুখে তরঙ্গিণীকে বলিল—তরি, দেখ দেখ, আমার কেমন খোকা হয়েছে!

তরঙ্গিণী সুখের গর্ব্বভরা হাসিমুখে বলিল—দিদি, খোকা ত তোমারই!

সেই দিন হইতে নৃত্যকালীর কাজ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এতদিন সে একটি বৃদ্ধ খোকা ও একটি তরুণী খুকিকে পরম যত্ন ও আগ্রহে মানুষ করিতেছিল, এখন আর-একটি নূতন শিশু খোকার ভার তাহার উপর পড়িল। খোকাকে তেল-মাখানো, সেঁক দেওয়া, নাওয়ানো, ধোয়ানো, দুধ খাওয়ানো, কাজল-পরানো সমস্ত তাহারই ভার। খোকা সমস্ত দিনরাত তাহারই কাছে থাকে, এক-একবার কেবল মাই দিবার জন্য সে খোকাকে তরঙ্গিণীর কোলে দেয়। তখন তরঙ্গিণী হাসিয়া বলে

—দিদি, তোমার খোকাকে আমি মাই দেবো কেন?

নৃত্যকালী সুখের হাসিতে দুঃখ ঢালিয়া দিয়া বলে—কি করব বোন, বিধাতা আমায় বঞ্চিত করেছেন। নইলে কি আমি তোকে এ কষ্টটুকুও দিতাম। আমায় বিধাতা দুধ দেন নি, তাই তোকে আমার খোকার দুধ-মা রেখেছি!

নৃত্যকালীর স্বামী একদিন ঠাট্টা করিয়া তাহাকে বলিল—খোকাকে পেয়ে যে আমাদের একেবারে ভুলে গেলে? আমাদের দিকেও একটু দেখো?

নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল—তোমায় দেখবার জন্যে ত তরিকে এনে দিয়েছি।

স্বামী লজ্জিত হইয়া প্রস্থান করিল।

তরঙ্গিণী একদিন হাসিয়া বলিল—দিদি, খোকা হয়ে অবধি তুমি আর আমার খোঁজও কর না, যে, তরি মলুল কি বাঁচল!

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের হস্তাঙ্গুলি চুম্বন করিয়া বলিল—ষাট ষাট, অমন কথা মুখে

আন্‌তে আছে! তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, সংসারের সুখ! তুই আমাকে সোনারচাঁদ খোকা দিয়েছিস, আমাদের এই আঁটকুড়ো নিরানন্দ সংসারে হাসি এনেছিস! তুই যে আমার ছোট বোন তরি! তোর ঘরসংসার তুই এখন চিনে শুনে নে—চিরকাল কি দিদির হাততোলা নিয়ে থাকবি? আমায় ছুটি দে, আমি আর সংসারের কেউ নই, আমি আর খোকা এখন দুজনে মিলে খেলা করবার ছুটি নিয়েছি, কাজ করবার অবসর এখন আর আমার নেই। আমি দেখতে শুনতে পারিনে, তুই এখন সব দেখ শোন। নিজের শরীরের যত্ন করিস, আর যে বুড়োটাকে তোর হাতে দিয়েছি, সেটাকেও একটু যত্ন করিস।

তরঙ্গিণী লজ্জিত হইয়া বলিল—না দিদি, সে আমি পারব না। তোমার কাজ আমি করতে যাব কেন? তুমি আমায় না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়, আমার কিছু ভালো লাগে না।

তরঙ্গিণীকে আবার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল—তুই এখন বড়সড় হয়েছিস,

এখনও দিদির হাততোলা হয়ে থাকলে লোকে বলবে কি ? বলবে, তোর ঘরসংসার আমি তোকে ঠকিয়ে দখল করে বসে আছি।

তরঙ্গিণী দৃষ্টিতে তিরস্কার ভরিয়া নৃত্যকালীর দিকে তাকাইয়া বলিল—দিদি, যাও তোমার সঙ্গে আড়ি ! ফের ওরকম কথা বল্লে আমি কেঁদে কেটে অনর্থ করব কিন্তু বলে রাখছি।

বলিতে বলিতেই তরঙ্গিণীর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অভিমান গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৃত্যকালী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া গালে কপালে চুম্বন করিয়া সজল চোখে হাসিয়া বলিল—ছি পাগলী, এই তুচ্ছ কথায় কাঁদলি !

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর কোলে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমান-ব্যথিত স্বরে বলিল—কেন তুমি আমাকে অমন কথা বললে ? বল আর কখনো বলবে না !

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—চুপ কর লক্ষ্মীটি, চুপ কর। আমি আর কখনো

বলব না। কিন্তু কখনো যদি তোর সংসারের ভার হাতে নেবার ইচ্ছে হয়, মুখ ফুটে আমায় বলতে লজ্জা করিস নে। তুই বলবা মাত্তর তোর ঘরকন্না তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি সরে একপাশ হব। কেবল খোকাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিসনে।

তরঙ্গিণী অশ্রুস্নাত মুখখানি তুলিয়া নৃত্যকালীর দিকে বেদনাভরা কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—দিদি, আবার ঐ কথা! আমি যে তোমার ভালোবাসায় কেনা দাসী! আমাকে ও-সব কী বলছ?

নৃত্যকালী তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—তুই আমার বোন, তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুই আমার খোকার দুধ-মা! তোকে আমি মন্দ ভেবে কিছু বলিনি! তবু কথাটা বলে রাখলাম!

এমনিতর সুখের মিলনে হাসি আনন্দে তাহাদের তিনটি প্রাণীর সংসার একটি শিশুকে ঘিরিয়া স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। খোকা দিনে দিনে তাহার নব নব আনন্দলীলা প্রকাশ করিয়া সংসারটিকে আনন্দে হাসিতে সুখে ভরিয়া তুলিতে লাগিল।

সদানন্দের বৈরাগ্য

খোকার যখন বছর দেড়েক বয়স; যখন সে চারটি ধবধবে শাদা দুধের-দাঁত বাহির করিয়া নৃত্যকালীকে বলে —জি, এবং তরঙ্গিণীকে তা-তি বলিয়া ডাকে; যখন সে দুধ খাইতে ও কাজল পরিতে বিষম আপত্তি জানাইতে শিখিয়াছে; এবং যখন সে হামাগুড়ি দিয়া ঘরের শিশি-বোতল ভাঙিয়া মধু ও তেল একত্র মিশাইয়া পেটে মাথায় মাখিয়া বাঃ বাঃ বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিতেছে; তখন একদিন সন্ধ্যাকালে নৃত্যকালী দালানে বসিয়া খোকার সহিত চাঁদামামার পরিচয় করিয়া দিতেছিল এবং চাঁদামামাকে খোকার কপালে একটি টি দিয়া যাইবার জন্য ধান ভানিলে কুঁড়ো, মাছ কুটিলে মুড়ো, উড়কি ধানের মুড়কির মোয়া দিবার লোভ দেখাইতেছিল; খোকা তাহার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুখানি বিস্তারিত করিয়া কচি কলার ছড়ার মতো আঙুলগুলি ঘন সঞ্চালিত করিয়া চাঁদকে ডাকিয়া ডাকিয়া নিজের কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিতেছিল—আ আ চি!—এবং এক-একবার মাতা নৃত্যকালীর দিকে ফিরিয়া বলিতেছিল—জি! চি!—আরবার তরঙ্গিণীর দিকে ফিরিয়া বলিতেছিল—তা-তি! চি!

এমন সময় উঠান হইতে কে একজন রমণী বলিয়া উঠিল—গেরস্তরা বাড়ী আছ গো ?

নৃত্যকালী বলিল—কে গা ?

আগন্তুক রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—আমরা কুটুম গো !

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে বলিল—তরি, দেখ ত কে ?

তরঙ্গিণী উঠিয়া দালানের ধারে গিয়াই বলিয়া উঠিল—ওমা, বামা যে ! তুই কোথেকে এলি ?

বামা হাসিয়া গলায় আঁচলের খুঁটটা দিয়া ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—মা ঠাকরুণের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে এইচি।

তরঙ্গিণী বলিল—মাসিমার সঙ্গে ! কৈ মাসিমা কোথায় ?

বামা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—মাঠাকরুণ, কৈ গো এস না গো।

আর একটি রমণীমূর্ত্তি অন্ধকার আবছায়া হইতে অগ্রসর হইয়া আসিল। তরঙ্গিণী তাড়াতাড়ি দালান হইতে উঠানে নামিয়া গিয়া দ্বিতীয় রমণীর পদধূলি লইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—দিদি, আমার মাসিমা এসেছেন।

নৃত্যকালী খোকাকে কোলে করিয়া দালানের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে তরঙ্গিণীর আহ্বানে উঠানে নামিয়া গিয়া তরঙ্গিণীর মাসিমার পদধূলি লইয়া বলিল— এস মা এস!

মাসিমা নৃত্যকালীকে লক্ষ্য না করিয়াই তরঙ্গিণীকে বলিল—তরু, এই বুঝি তোর খোকা?

এই প্রশ্নে তরঙ্গিণীর কেমন লজ্জা বোধ হইল। খোকা কেবল তাহার, এ কথা সে নৃত্যকালীর সম্মুখে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে? খোকা যে তাহার অপেক্ষা তাহার দিদিরই বেশি, ইহাও বা সে কেমন করিয়া একজন আগন্তুক বাহিরের লোককে বুঝাইবে? তাহারা দুই সতীন স্নেহ ও সখিত্বের যে মধুর সম্পর্ক পাতাইয়া নিরুপদ্রবে খোকাকে লইয়া আনন্দে আছে তাহার মধ্যে একজন অপর লোক আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তরঙ্গিণীর মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইল। তরঙ্গিণীর মনে হইল তাহারা বেশ ছিল, তাহাদের এই সুখনীড়ের মধ্যে তাহার মাসিমা কেন আসিয়া পড়িল তাহার মাসিমা কি তাহাদের ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিবে? তরঙ্গিণী

আর মাসিমার দিকে চাহিতে পারিল না। সে কোনো কথা না বলিয়া লজ্জিত মুখ নত করিয়া রহিল।

মাসিমা এই সলজ্জ নীরবতা তরঙ্গিণীর নব মাতৃত্বের লক্ষণ মনে করিয়া হাত বাড়াইয়া খোকাকে বলিল—এস দাদা বাবু, এস!

খোকা দুইহাতে নৃত্যকালীর বুকের ও পিঠের কাপড় মুঠি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া নৃত্যকালীর বুকের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া লাগিয়া গিয়া বলিল—জি, ভ!

নৃত্যকালী খোকাকে একটু ঠেলিয়া মাসিমার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—যাও লক্ষ্মী মাণিক আমার, যাও! উনি দিদিমা! ভয় কি?

খোকা সে কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল—ভ!

বামা একমুখ হাসিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া বলিল—আমার ঠেঞে এসবে খোকাবাবু?

খোকা তেমনি ভাবে নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—ভ! ভ!

মাসিমা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—অচেনা লোকের কাছে যায় না বুঝি? এই নেও দাদামণি, দেখ!

মাসিমা দুটি টাকা বাহির করিয়া খোকার সম্মুখে ধরিল। খোকা টাকা লইতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া কেবলি বলিতে লাগিল—ভ! ভ!

তখন নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে বলিল—তরি, তুই নে ত। তোর কাছে গিয়ে যদি মাসিমার কাছে যায়।

তরঙ্গিণী হাত পাতিল।

খোকা নৃত্যকালীকে জড়াইয়া থাকিয়াই তরঙ্গিণীকে বলিল—তা-তি, ভ!

মাসিমা অপ্রতিভ হইয়া তরঙ্গিণীকে বলিল—তরু, তোর ছেলে ত বাছা আমার কাছে আসবে না। এই নে তোর বেটাকে সন্দেশ কিনে খাওয়াস। মিষ্টিমুখ হলে যদি আমায় মিষ্টি চোখে দেখে।

তরঙ্গিণী একবার নৃত্যকালীর মুখের দিকে তাকাইয়া আবার মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল।

নৃত্যকালী বলিল—আবার টাকা কেন মাসিমা! পায়ের ধুলো দিয়ে অমনি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের এই কত দুঃখের গুঁড়োটুকু বেঁচে থাক! খোকা আমার কোল বাছে না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছ বাপু, ও মুখই দেখতে

পাচ্ছে না। এস দালানে এস! তরি, একখানা কিছু পেতে দে বসতে।

মাসিমা নৃত্যকালীর কোনো কথায় সাড়া না দিয়া তরঙ্গিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—জামাই কোথায়, ওদিকে জামাই নেই ত?

মাসিমা যে নৃত্যকালীর সহিত কথা কহিতেছে না ইহা তরঙ্গিণীর মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। কাজেই সেও মাসিমার কোনো কথার জবাব দিতে পারিতেছিল না।

নৃত্যকালী বলিল—না, উনি বাড়ীতে নেই। এস মাসিমা। তরি, মাসিমার পা ধোবার জল দে, ওঁর গরদ-খানা দে। মাসিমা কাপড় ছেড়ে জপ করে নিন, আমি খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে জলখাবার করে আনি।

তরঙ্গিণী মাসিমার কাছ হইতে সরিয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল।

কিন্তু যখন নৃত্যকালী জলখাবার আনিতে গেল তখন তরঙ্গিণীকে একাকী তাহার মাসিমার কাছে থাকিতে হইল। ইহাতে সে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মাসিমা বলিল—তরু, ঐ তোর সতীন?

সতীন শব্দটা তরঙ্গিণীর কানে বাজিল। সে মৃদুস্বরে বলিল—উনিই দিদি!

—তোকে খুব কষ্ট দ্যায় দেখছি।

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিল—না মাসিমা, দিদি আমায় খুব ভালোবাসেন।

মাসিমা বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিল—আ নেকি, তুই তেমন নেকিই আছিস এখনো! একটা মিষ্টি কথা বললেই ভুলে যাস! মিছরীর ছুরী মুখে মিষ্টি লাগে বলে' মনে করিস যে বুকে যখন বেধে তখনও তেমনি মিষ্টি লাগে? ঐ বুঝি তোর ভালোবাসা। এসে বাড়ীতে পা দিতেই ত বুঝতে পারছি, তুই বাড়ীর দাসী, আর বাড়ীর গিন্নি ঐ ডাইনি মাগী! তরি যা পা ধোবার জল দে, তরি যা কাপড় দে, তরি যা বসতে দে! আর আমি যাই জলখাবার দি! তুই দাসীর খাটনা খেটে মরবি, কিন্তু সংসারটী ওর মুঠোর ভেতর! তোর সংসারে তুই পরের হাততোলায় কেমন করে আছিস! আমরা হ'লে ত একদণ্ড থাকতে পারতাম না!

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিল—এর আর হাততোলা থাকা কি? দিদি যদি অযত্ন করতেন ত কষ্ট হ'ত! দিদি নিজে না খেয়ে আমায় খাওয়ান, নিজে না পরে' আমায় পরান, দিদি আমার ছেলেকে মায়ের বাড়া যত্ন করেন।

মাসিমা হাসিয়া বলিল—ওরে তাইত কথায় বলে—মায়ের চেয়ে যে ভালোবাসে তারে বলে ডা'ন! ঐ ডাইনি মাগী তোকে গুণ করেছে নিয্যস। ছেলেকে অত ন্যাওটো করচে কেন তাও বুঝি বুঝতে পারিসনে হাবা মেয়ে! ছেলে ওর ন্যাওটো হ'লে তোকে নাথি ঝ্যাঁটা কোস্তা বাড়ন মারলেও তুই ওর কিছু করতে পারবিনে; ছেলের জন্যে তোকে সব সয়ে থাকতে হবে। দুটো মিষ্টি কথা আর লোক-দেখানো আত্তি, এই দেখেই তুই ভুলেছিস! সতীন সম্পক্ক কি কখনো ভালো হয়রে নেকি! শক্ত হ, শক্ত হ, এখনো সময় আছে, ছেলেটাকে ডাইনির মায়া থেকে বাঁচা! কথায় না বলে, বাঁঝার আত্তি বাঘিনীর পথ্যি! তাতে এ আবার বাঁঝা সতীন!

তরঙ্গিণী লজ্জায় ঘৃণায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে তাহার মাসিমাকে কেমন করিয়া বলিবে যে, যেদিন হইতে

সে এবাড়ীতে আসিয়াছে সেই দিন হইতে স্বামী সম্পূর্ণ তাহার, দিদি তাহার সতীন নয়। তরঙ্গিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল—দেখি জলখাবার হ'ল কি না।

মাসিমা খুসি হইয়া বলিল—হ্যাঁ, নিজের ঘরকন্না নিজে দেখ শোন, এই ত চাই!

তরঙ্গিণী মনে করিল সতীন সম্পর্কটা বড় খারাপ, সহজেই লোকে ভুল বুঝিয়া অবিচার করিয়া বসে। মাসিমা দুদিন থাকিলেই বুঝিতে পারিবে দিদি তাহার কেমন মানুষ।

দুদিন ছাড়িয়া চারিদিন গেল, মাসিমার ধারণার কোনো পরিবর্ত্তন সে বুঝিতে পারিল না। মাসিমা ও তাঁহার সহচরী বামা নিরন্তর তাহার কানে বিষ উদ্গিরণই করিতেছে।

তরঙ্গিণী অতিষ্ঠ হইয়া একদিন নৃত্যকালীকে বলিল—দিদি, ওরা কবে যাবে? যোগ ফোগ ত চুকে বুকে গেল; আর কতদিন গঙ্গা নাইতে হবে?

নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল…কেন তরি, মাসিমা দুদিন আছেন তাতে তুই ব্যাজার হচ্ছিস্ কেন?

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর হাসির সঙ্গে হাসিতে পারিল না। সে গম্ভীর ভাবে বলিল—না দিদি, আমরা দুটিতে নিরিবিলি বেশ ছিলাম, কোথা থেকে এক যোগ নয়ত গোলযোগ এসে জুটল! দিদি, পাজি পাঁজিগুলো এত গোলযোগও বাধাতে জানে!

নৃত্যকালী একটু তিরস্কারের স্বরে বলিল—ছি, অমন কথা মুখে আনতে নেই। মাসিমা শুনতে পেলে কি ভাববেন? তোর বাড়ীতে ত আর ওঁরা চিরকাল থাকতে আসেন নি। তুই অত ব্যস্ত হচ্ছিস্ কেন?

তরঙ্গিণী কেমন করিয়া বলিবে সে কেন ব্যস্ত হইতেছে। তাহার যে দুঃখ তাহা সহিবারও নয় বলিবারও নয়। তরঙ্গিণী বলিল—ব্যস্ত হব না? খোকা হয়ে অবধি ত তুমি আমায় আগের মতন যত্ন কর না; তার ওপর মাসিমা এসে ত তোমায় একদণ্ড কাছে পাওয়াই ভার হয়েছে। তুমি আর কারু বেশি যত্ন করলে আমার বড় রাগ হয়!

নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিণীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের হস্ত চুম্বন করিয়া বলিল—হিংসুটে, ভয় নেই রে

ভয় নেই, তোর দিদিকে তুই না ছাড়লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

ইহার পর তরঙ্গিণী নৃত্যকালীকে আর কিছু বলিতে পারিল না। সে আস্তে আস্তে গিয়া মাসিমার কাছে বসিয়া বলিল—মাসিমা, তুমি কবে বাড়ী যাবে?

—বাড়ী ত শিগগির যাওয়া দরকার। বাড়ীতে সব অবিলি করে' ফেলে ছড়িয়ে রেখে এসেছি, ইঁদুরে বাঁদরে কি করছে তার ঠিক নেই। কিন্তু তোর ঘরকন্নারও ত একটা বিলিবন্দেজ না দেখে আমি নড়তে পারছিনে।

—আমার ঘরকন্নার বিলিবন্দেজ আমি করে নেব; তার জন্যে তোমার ঘরকন্না অবিলি করে থাকতে হবে না মাসিমা।

—কেন, আমাকে তুই তাড়াতে পারলে যে বাঁচিস দেখছি!

তরঙ্গিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না তা কেন। তবে জামাইবাড়ী এতদিন এসে আছ, আমার ভারি লজ্জা করছে।

—জামাই কি কিছু বলেছে?

—না।

—তবে ঐ ডাইনি মাগী কিছু বলেছে বুঝি! যাই দেখি একবার মাগীর ধুদ্ধুড়ী ধুয়ে দিয়ে আসি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! আমি কি তার বাপের বাড়ীতে এসেছি?—এ আমার আপনার বোনঝির বাড়ী! খুব করব আসব! একবার কেন একশ বার আসব! কোথায় সে শতেকখোয়ারী হারামজাদী মাগী!

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ মাসিমা, কি কর? দিদি কিচ্ছু বলেনি।

বামা হাসিয়া পরম বিজ্ঞভাবে বলিল—মুখে না বলুক মনে মনে বলেছে। গুণ করে' নিজের মনের কথাটা অ্যার মনে চালান করে দিইচে।

মাসিমা বলিল—বামা, আজকে ত শনিবার আছে। আজ সন্ধ্যেবেলা তোর সেই জলপড়াটা তরুকে দিস ত! গুণ-টুন-গুনো কেটে যাবে।

বামা বলিল—তাই খেয়ো দিদিমণি, তাই খেয়ো। বড় জর্বর জলপড়া। এ আমাদের গাঁয়ের বিন্দে হাড়ি তুষ্ট গয়লাকে শিখিয়েছিল; তার ঠেঞে মোর শিক্ষে। এর

ফল পেরতক্ষ হাতে হাতে দেখে নিয়ো। যেমন জলটুকু খাবে এমনি বুক এস্তক হিম হয়ে যাবে, প্রাণডা যেন জুড়োবে! আর যে নোক গুণ ওষুধ করেছে তাকে একেবারে বিষ নজরে দেখবে।

দিনের পর দিন অহরহ ও অনুক্ষণ এইরূপ মন্ত্র জপ শুনিতে শুনিতে ক্রমশ তরঙ্গিণীর মনও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সত্যই ত সতীন তাহাকে কেন ভালো-বাসিবে, সতীনকে কি কখনো ভালোবাসা যায়? যে স্বামীর ভাগ কাড়িয়া লইয়াছে তাহাকে ভালোবাসা কি সোজা কথা? আর-একজন মেয়ে যদি নোলক পরিয়া মল বাজাইয়া এখন তাহার স্বামীর হৃদয় জুড়িয়া বসে তবে কি তরঙ্গিণী তাহাকে একদণ্ডও বরদাস্ত করিতে পারে? সে তাহাকে নখে টিপিয়া মারিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়! নিজের ছেলে হয় নাই বলিয়া নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে ঘরে আনিয়াছিল; এক্ষণে তাহার ছেলেটি দখল করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে। ছেলে হওয়ার পর হইতে নৃত্যকালী ত বাস্তবিকই তাহাকে আর তেমন যত্ন করে না, তাহার খাওয়া পরা সম্বন্ধে আগের মতো খোঁজ খবর লয়

না। সমস্ত সংসার তাহার মুঠার ভিতর, সে হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তরঙ্গিণীর। পাছে তরঙ্গিণী নিজের সংসার দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লয় তাই তাহাকে নৃত্যকালী সংসারের একখানা কুটা ভাঙিয়া দুখানা করিতে দেয় না। তরঙ্গিণীকে একটিও কাজ করিতে না দিয়া নৃত্যকালী যে একাই খাটিয়া মরে, ইহা ত তাহার মমতা নহে, পূরাদস্তুর স্বার্থপরতা! তরঙ্গিণীকে সমস্ত হইতে বঞ্চিত করিবার ফন্দি! সমস্তর না হোক, সে অর্দ্ধেকের ভাগী ত? অর্দ্ধেকেরই বা কেন? নৃত্যকালীকে অশ্রদ্ধা করিয়া ত্যাগ করিয়াই না তাহার স্বামী তাহাকে বিবাহ করিয়াছে? তাহার স্বামীর যে পুত্রধনের অভাব নৃত্যকালী হইতে মিটে নাই তাহা সেই না মিটাইয়াছে? সমস্ত তাহার—স্বামী তাহার, খোকা তাহার, ঘরকন্না তাহার! অথচ তাহার যেন কিছুই নয়—স্বামী যেন নৃত্যকালীর দয়ার দান, খোকা বাজেয়াপ্ত, ঘরকন্না বেদখল! ইহার প্রতিকার তাহাকে করিতেই হইবে।

এত কথা তরঙ্গিণী নিজে গুছাইয়া মনে ভাবিতে পারে নাই। তাহার মাসিমা ও মাসিমার সহচরী বামা বিনাইয়া

বিনাইয়া গুছাইয়া গুছাইয়া তাহার মনের সম্মুখে এই-সমস্ত কথা দিনের পর দিন সাজাইয়া ধরিতেছিল।

তরঙ্গিণী মুখ ভার করিয়া থাকে। নৃত্যকালী যদি জিজ্ঞাসা করে—তরি, তোর হ'ল কি? অমন করে' থাকিস কেন?

তরঙ্গিণী বলে—না, কিছু ত হয়নি। শরীরটা ভালো নেই।

প্রথম-প্রথম নৃত্যকালী মনে করিত যে মাসিমা এতদিন আছে বলিয়া বোধ হয় তরঙ্গিণী কুণ্ঠিত ও বিরক্ত হইতেছে। কিন্তু সে অল্প লক্ষ্য করিয়াই বুঝিল যে তাহার অনুমান যথার্থ নয়; এখন তরঙ্গিণী সদাসর্ব্বদাই তাহার মাসিমার কাছে কাছেই থাকে; তিনজনে মিলিয়া সর্ব্বদাই ফিসফিস গুজগুজ হয়, নৃত্যকালীকে দেখিলেই চুপ করে। নৃত্যকালী বুঝিল যে একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু সে তরঙ্গিণীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

তরঙ্গিণীর মনে বদ্ধমূল ধারণা হইয়া গেল যে নৃত্যকালী এতদিন তাহাকে নিছক ঠকাইয়া আসিয়াছে। এখন সংসারের ভার তাহার নিজের হাতে না লইলে নয়। তখন

তাহার মনে পড়িল যে নৃত্যকালী একদিন তাহাকে বলিয়াছিল যে যেদিন তাহার ইচ্ছা হইবে মুখ ফুটিয়া বলিলেই সে সংসার হইতে সরিয়া যাইবে।

তরঙ্গিণী আস্তে আস্তে গিয়া নৃত্যকালীর কাছে বসিল। নৃত্যকালী একবার তাহার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তরি, এতদিনে দিদিকে মনে পড়ল? এখন আর দিদির কাছে থাকতে ভালো লাগে না, না?

তরঙ্গিণী বাঁ হাতের বালা ডান হাত দিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—দিদি, ভাঁড়ার-ঘরের আর সিন্দুকের চাবিগুলো আমাকে দাও।

নৃত্যকালী তাহার কথার অর্থ না বুঝিতে পারিয়া বলিল—কেন, কি নিবি?

তরঙ্গিণী মাথা নত করিয়া বলিল—কিছু নেব না।

—তবে?

—চাবিগুলো আমার কাছেই রাখব।

—তা হলে সংসার থেকে আমায় এতদিনে ছুটি দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিণীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল—আঃ! বাঁচলাম তরি! তোর ঘরকন্না তোরই ত দেখা উচিত। এই নে চাবি। কিন্তু খোকাকে কেড়ে নিসনে, লক্ষ্মী বোন আমার!

নৃত্যকালীর চোখ হইতে বড় বড় ফোঁটায় দরদর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তরঙ্গিণী সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িল। সে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল—তরি, চাবি যে পড়ে রইল!

তরঙ্গিণী বলিল—না দিদি, চাবি আমার চাইনে। ও তোমারই থাক।

কোথা হইতে মাসিমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া চাবিগুলি হস্তগত করিয়া বলিল—তরু, বড় মেয়ে তোকে চাবি দিচ্ছে, নে। কেমন মেয়ে বাছা, বড় মেয়ে চাবি রাখবে না, তুই রাখবি নে, ত রাখবে কে? থাক তবে আমারই কাছে।

মাসিমা চাবিগুলি লইয়া তরঙ্গিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ

প্রস্থান করিল। নৃত্যকালী অবাক হইয়া মাসিমার গমন-পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মাসিমা গিয়া তরঙ্গিণীকে ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিল—ন্যাকা মেয়ে কোথাকার! ডাইনির চোখের মায়া-কান্না দেখে অমনি গলে' গেলেন! ভাগ্যিস আমি কাছাকাছি ছিলাম!

বামা বলিল—সব ত নিলে, কিন্তু মাগীর প্যাঁটরাটা ত দেখলেনি। ঐটার মধ্যে ও সব লুকিয়ে রেখে দিইচে।

মাসিমা বলিল—ভালো বলেছিস্ বামা! দেখ তরু, মাগীটার প্যাঁটরা একবার খুলে দেখে নিগে যা।

তরঙ্গিণী জোরে ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—সে আমাকে দিয়ে হবে না মাসিমা।

—তবে আমি বলিগে।

—না মাসিমা, খবরদার ও রকম ক'রে দিদিকে অপমান করলে আমি মাথায় কাটারী মেরে রক্তগঙ্গা হব।

মাসিমা অমনি নাকি কান্নার সুরে বলিয়া উঠিলেন—ওমা, কি সর্ব্বনেশে কথা বলিস তরু! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! কি জবর ডাইনি ও মাগী! তোকে

একেবারে বশ করে' ভেড়া করে রেখেছে ! তোর যা-খুসি করগে যা ; কালকে আমি বাড়ী চলে যাব। কেন রে বাপু —নিজের সব বইয়ে ছইয়ে পরের জন্যে বুকের রক্ত জল করা !

মাসিমা ক্রমশ ফোঁস-ফোঁস করিতে করিতে চক্ষে অঞ্চল আরোপ করিল। বামাও চোখ মুছিতে লাগিল।

তরঙ্গিণী শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; একটিও সান্ত্বনার কথা বলিল না।

পর দিন মাসিমার বাড়ী যাইবার কোনো উদ্যোগই দেখা গেল না। বরং উল্টা মাসিমা ভাঁড়ার-ঘরের চাবি হাতে পাইয়া সংসারের বিলিবন্দেজ করিতে মনঃসংযোগ করিল। রোজ দুধ লওয়া হয় দুই সের—এক সের খোকা খায়, আধ সের খোকায় বাবা খায়, বাকি আধ সের নৃত্যকালী ও তরঙ্গিণী খাইত। মাসিমা আসার পর নৃত্যকালীর দুধের ভাগ মাসিমার বরাদ্দ হইয়াছিল। সেই বরাদ্দই কায়েমী হইয়া গেল। রাত্রে সকলেই লুচি খাইত ; এখন নৃত্যকালীর জন্য ভাতের বরাদ্দ হইল—এয়োস্ত্রী মানুষের দুবেলা ভাত খাওয়াই ত উচিত। মাসিমা বিধবা মানুষ তাঁহার লুচি ত না খাইলেই

নয়। বছরে চারখানা কাপড়ের বেশি কেনা বাজে খরচ, ফোতো নবাবী—নৃত্যকালীর বাক্সভরা কপড় আছে, পূজার সময় তাহার আর নূতন কাপড় কেনার দরকার নাই। নৃত্যকালী দোক্তা খায় বলিয়া তাহার পানের খরচ বেশি—নেশা ভাঙ যাহার করিতে হয় সে নিজের খরচে করুক, সংসার হইতে সে বাজে খরচের জন্য পয়সা কেন পাইবে? বাড়ীতে দুজন দাসী ছিল, একজন সংসারের ঘরকন্নার কাজ করিত, আর একজন দুই বৌ-এর কাজ করিত—এখন একজনা ঘরকন্নার কাজ করিয়াই ছুটি পায় না, অপরজন তরঙ্গিণীর কাজ করিয়া মাসিমার বাতে তেল মালিশ করিয়া ও মাথার পাকা চুল তুলিয়া সময় পায় না।

নৃত্যকালী কিন্তু হাসিমুখেই এ-সমস্ত সহ্য করিতেছিল। সে একদিনে দোক্তা আর পান খাওয়া ছাড়িয়া দিল; নিজের কাপড় সে নিজে কাচে; অশ্রদ্ধার দানও সে হাসিমুখে গ্রহণ করে। কেহ তাহাকে কাজ করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে—বাড়ীতে দুটি বৈ ত ঝি নেই, কুটুম্ব মানুষ বাড়ীতে, পাছে তাঁহাদের কষ্ট হয় তাই ঝিয়েদের ওঁদের কাছে-কাছেই থাকতে বলে দিয়েছি।

এইরূপ বিলিবন্দোজ করিয়া মাসিমা যখন দেখিল যে নৃত্যকালী কোনো আপত্তি তুলিল না, জামাইয়ের কানেও এ কথা উঠিল না, তখন সে সাহস পাইয়া তরঙ্গিণীর কানে মন্ত্রজপ করিতে সুরু করিয়া দিল—দেখ তরু, তুই কি ভাবছিস জানিনে, আমি তোরই ভালোর জন্যে সংসারের খরচ কমিয়ে আনছি—যে দুপয়সা বাঁচবে সে তোরই, আমার কি বল্‌না! কিন্তু মাগী কি সয়তান, টুঁ শব্দটি করছে না! ও কি তুকতাক করবার মতলবে আছে। তোর সোয়ামীর কাছে তোর যে আদর সে তোর খোকার জন্যেই না? নইলে ও হ'ল গিয়ে ওর সময়ের বৌ, ওর ওপর সোয়ামীর যতখানি টান হবে ততখানি কিছু আর তোর ওপর হবে না। এখন খোকার কোনো রকম ভালো-মন্দ কর্‌তে পারলেই ওর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এখন খোকাকে ত ওর ত্রিসীমানায় যেতে দেওয়া ঠিক হবে না। দেখিস্‌নে খোকাকে সামনে বসিয়ে একদৃষ্টে হাঁ করে' কেমন তাকিয়ে থাকে।

তরঙ্গিণীর বুকের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। বাস্তবিক ত সে দেখিয়াছে নৃত্যকালী খোকাকে সামনে বসাইয়া

একদৃষ্টে তাহাকে দেখে। তাই সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল—অমন করে তাকিয়ে থাকলে কি হয়?

বামা বলিল—বুকের রক্ত শুষে লেয় গো বুকের রক্ত শুষে লেয়! মন্তর পড়ে' সাত দিন তাকালেই হাতি মালট খায়, ও ত একরত্তি বাচ্চা! আমাদের গাঁয়ের ইচ্ছে বুড়ী অমনি করে' আমার ভাসুর-পোর পেরাণডা শুষে খেয়েছিল —না গা মা ঠাকুরুণ, তুমি ত সব জান!

মাসিমা মুখ অত্যন্ত ম্লান করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—হাঁ মা, জানি বলেই ত ভাবনা! কিন্তু তরু ত কথা শুনবে না। জামাইকে বলে' ওকে এক্ষুনি বাড়ী থেকে বিদেয় করে দেওয়া উচিত।

মাসিমার অবিশ্রাম মন্ত্র জপে তরঙ্গিণীর মন নৃত্যকালীর উপর বিরূপ হইয়া উঠিলেও সে একবার বাঁকিতেছিল, এক-একবার দিদির প্রাণ-ঢালা স্নেহ স্মরণ করিয়া সমস্ত বিরূপ ভাব মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু যখন তাহার বিশ্বাস জন্মিল যে তাহার সৌভাগ্যের নিদান বুক-চেরা ধন খোকাকে প্রাণে মারিবার জন্য নৃত্যকালী চেষ্টায় আছে, তখন তরঙ্গিণীর মন নৃত্যকালীকে একেবারে

বিষের মতো বোধ করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তরঙ্গিণী স্বামীকে গিয়া বলিল—ওগো শুনেছ, বড়গিন্নি আমার খোকাকে রোজ তুক করে……

নৃত্যকালী কিছু না বলিলেও তাহার স্বামী অনুমানে বুঝিতে পারিতেছিল যে মাসিমার ব্যবহার নৃত্যকালীর প্রতি বিশেষ হৃদ্য ত নহেই, বরং নৃত্যকালী যেন কিছু উৎপীড়িত হইতেছে। মাসিমা আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া তাহাদের সুখের সংসারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটানোতে তরঙ্গিণীর স্বামী তরঙ্গিণীর উপরও একটু বিরক্ত হইয়াই ছিল, মনে করিতেছিল সেই বোধ হয় মাসিমাকে ধরিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছে। তাই এখন তরঙ্গিণীকে নৃত্যকালীর নামে লাগাইতে শুনিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল—যাও যাও যাও, ওসব ছোটলোকের মতন কথা শুনতে চাইনে। ও বুকের রক্ত জল করে' তোমার ছেলে মানুষ করছে কি না, তার এই পুরস্কার! কে তোমাকে এসব শেখাচ্ছে? আগে ত তুমি এমন খোলো ছিলে না। ফের ও রকম কথা মুখে

আনন্দে ঝাড়ে মুলে সবাইকে একদিনে একসঙ্গে দূর করে' দেবো !

সূত্রপাতেই স্বামীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া তরঙ্গিণী কাঁদিয়া গিয়া মাসিমার কাছে পড়িল। মাসিমা সব শুনিয়া বলিল—এ-সমস্তই ঐ ডাইনি মাগীর খেলা ; ও মন্তর পড়ে' তোর ওপরে জামাইয়ের মন চটিয়ে দিচ্ছে। হয় নয় তুই ভেবে দেখ—জামাই কি কখনো তোকে এমন করে' একদিনও বকেছে ? তরঙ্গিণী দেখিল, সত্যই ত, স্বামী শুধু সোহাগই করিয়াছে, তিরস্কার আজ এই প্রথম এবং অতি অকস্মাৎ ! তখন তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তাইত মাসিমা, তবে কি হবে ?

মাসিমা গম্ভীর ভাবে বলিল—আমি ত বাছা কবে থেকে পয় পয় করে বলছি যে বিষদাত চেপে বসবার আগে সাবধান হ। এখন ও কামড়ে ধরেছে—তোর কপাল ভাঙতে আর দেরি নেই। সোয়ামীর মন কেড়ে নিলে, ছেলে কেড়ে নিলে, তোর আর থাকল কি ! আহা, ছেলে নয় ত যেন রাজপুত্তুর ! রোগে ভোগে মরে, সহ্য হয়, এ আলটপকা গিলে খাবে গা !

সর্ব্বনাশের সম্ভাবনায় শিহরিয়া উঠিয়া তরঙ্গিণী কাঁদিয়া মাসিমার পায়ে পড়িয়া বলিল—মাসিমা, আমার খোকাকে তুমি বাঁচাও!

মাসিমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাঁচাই আর কেমন করে' মা—মাগীর চোখের আড়াল না করলে শিবের সাধ্য নেই যে বাঁচায়। একেবারে মকৃথম কামড় কামড়েছে! ছেলে দিনকের দিন একেবারে নীলমূর্ত্তি হয়ে উঠছে দেখছিস নে?

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তবে মাসিমা আমি খোকাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই চল।

মাসিমা হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না মা, তাতেই কি নিস্তার আছে! খোকার নাড়ী পোঁতা যে এখানে! নাড়ীর টানে ঐ প্রাণপুরুষকে টেনে বার ক'রে আনবে!

তরঙ্গিণী ভয়ে একেবারে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া বলিল—মাসিমা, তবে উপায়?

—উপায় এক-মাত্তর ঐ মাগীকে সরানো।

—কেমন করে' সরাব? ওঁকে বলতে গেলাম...

বামা বলিয়া উঠিল—না না, অমন ক'রে নয়।

ডাইনিকে কি অমন ক'রে সরায়? তুক তরিবৎ করে সরাতে হয়।

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তুই কিছু জানিস বামা?

বামা ঘাড় কাত করিয়া আতার বীচির মতো মিশি-দেওয়া কালো কালো দাঁত বাহির করিয়া বলিল—হিঁ: তেরোস্পর্শ দিনে তেমাথা পথের ওপর ঘেঁটকল আর নির্ব্বিষষী দিয়ে ঘেঁটুঠাকুরুণের পূজো করতে হবে; উপোষ করে ভরসন্ধ্যেবেলা ঠিক যেই একটি তারা উঠেছে অমনি একটা আফলা শিমুল গাছের কাছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সাতটা পাতা তুলতে হবে, আর মন্তর বলতে হবে—

শিমুল, শিমুল, শিমুল!
শত শত্তুর নির্ম্মূল!
আঠায় কাঁটায় ভরা গা,
শত শত্তুরের মাথা খা!
আঠায় আঁটো
কাঁটায় বেঁধো,
যে আমার সঙ্গে শত্তুরতাই সাধে
তার সঙ্গে শত্তুরতাই সেধো!

তারপর সেই সাতটি পত্তর মাথায় করে নিয়ে গিয়ে উলুঙ্গু হয়ে জলে যমের দুয়োর দক্ষিণমুখো হয়ে একটা ডুব দিতে হবে। পাতা সাতটি ভেসে উঠলেই বুঝবে যে নির্বিষষী হয়েছে; আর, একটি পাতাও যদি মাথায় লেগে থাকে তবে বুঝবে যে কামড় তখনো ছাড়েনি।

মাসিমা তাড়াতাড়ি বলিল—তোর সেই পাগলাকালীর গুঁড়োটা তরুকে দিস না? যত-বড়ই ডাইনি হোক, মা কালীর কাছে আর বড়াই খাটবে না।

বামা বলিল—হ্যা দ্যাখ! ডাকিনী যোগিনী হল গে মা-কালীর দাসী, মা-কালীর কাছে তাদের আবার বড়াই কি? বড্ডি মনে করেচ মাঠাকরুণ! সেই গুঁড়োর একরত্তি দিলেই যত-বড় ডাইনি হোক চোখ উল্টে পড়তেই হবে। সে গুঁড়ো কি আমি কম কষ্টে জোগাড় করেছিনু? গয়েসপুরের কালীর মোহন্তকে একবোতল মদ দিয়ে ছিদাম মোড়ল এনেছিল—বললে না পেত্যয় যাবে, অমাবস্যের রাত্রে চাঁড়ালের মাথার খুলিতে চিতার আগুনে মদ দিয়ে ঐ ওষুধ তৈরি! ওর কি কম মাহাত্তির!

এই বলিয়া বামা করজোড়ে উদ্দেশে কি জানি কাহাকে

প্রণাম করিল। দেখা-দেখি মাসিমাও প্রণাম করিল। ভয়ে ভয়ে তরঙ্গিণীও করিল।

তরঙ্গিণী বলিল—সে কি গুঁড়ো? বিষ-টিষ নয় ত?

বামা বলিল—আরে রাম রাম! বিয় লয়, বিষ লয়। মা-কালীর পেরসাদ, চরণধূলি!

স্থির হইয়া গেল বামার উপদেশ অনুসারে তরঙ্গিণী নৃত্যকালী ডাইনিকে ঝাড়াইয়া ভিটাছাড়া করিবে।

একাদশীর দিন সমস্ত তুকতাক করিয়া তরঙ্গিণী এক বাটি দুধের সঙ্গে একটা শাদা গুঁড়ো মিশাইয়া রাখিল, রাত্রে নৃত্যকালীকে খাইতে দিবে, সকালে সে চক্ষু উল্টাইয়া পড়িয়া থাকিবে। তরঙ্গিণী বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ বামা, ও বিষ-টিষ নয় ত?

বামা বলিল—বিষ কেনে হবেক গো? আমরা কি মানুষ খুন করি?

তরঙ্গিণী ভয়ে বিবর্ণ শুষ্ক মুখে বলিল—দেখিস বামা, হিত করতে যেন বিপরীত না হয়।

বামা জোর দিয়া বলিল—লা গো লা, তোমার কিচ্ছু ভয় লেই।

সন্ধ্যার পর নৃত্যকালী রান্নাঘরে খোকার দুধ আনিতে গেল। তাহাকে রান্নাঘরে যাইতে দেখিয়াই তরঙ্গিণী জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, কি নেবে?

—খোকার দুধ।

—খোকার দুধ ঐ ক্ষিস্তুরে বাটিতে আছে। ঐ সরফুলে বাটির দুধ নিয়ো না যেন, ও দুধ তোমার জন্যে আছে।

নৃত্যকালী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া বলিল—আমার জন্যে! আমি কি দুধ খাই?

তরঙ্গিণী থতমত খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া বলিল—মাসিমার আজ একাদশী কি না, তাই একটু রেখেছি।

নৃত্যকালী আর কিছু না বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া দু-বাটির দুধ এক করিয়া খোকাকে খাওয়াইতে লইয়া গেল।

তরঙ্গিণী দেখিল যে নৃত্যকালী জগন্নাথী বাটিতেই দুধ লইয়া গেল। কিন্তু তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই শাদাগুঁড়ো মা-কালীর চরণরেণু বলিয়া এতক্ষণ মনকে বোকা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও, ভুলক্রমে খোকার তাহা খাওয়ার সম্ভাবনা মনে করিয়া তরঙ্গিণী ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া

উঠিল। সেই শাদা গুঁড়া যে বিষ, ইহা এখন সে নিজের মনের কাছে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল সাদা গুঁড়া মিশাইয়াছিল সরফুলে বাটিতেই ত ঠিক? শ্রীক্ষেত্রের বাটিতে ত নয়? ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত গোলমাল ঠেকিতে লাগিল—একবার মনে হয় শ্রীক্ষেত্রের বাটিতে গুঁড়া মিশাইয়াছে, একবার মনে হয় সরফুলে বাটিতে। সে ব্যস্ত হইয়া রান্নাঘরে যে বাটি আছে তাহাতে আঙুল দিয়া দেখিতে গেল তলায় গুঁড়া থিতাইয়া আছে কি না। বাটিতে আঙুল দিতেই দেখিল বাটিতে দুধ নাই, বাটির তলায় গুঁড়া কিচকিচ করিতেছে! তরঙ্গিণী একেবারে পাগলের মতো হইয়া ঝড়ের বেগে ঘর হইতে ছুটিয়া যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—দিদি, ও দুধ খোকাকে খাইয়ো না, খোকাকে ও দুধ খাইয়ো না!

তরঙ্গিণী ছুটিয়া আসিয়া দালানে উঠিয়া দেখিল নৃত্যকালী খোকাকে ঝিনুকে করিয়া দুধ খাওয়াইতেছে! তরঙ্গিণী বাঘিনীর মতো ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একহাতে নৃত্যকালীর হাত চাপিয়া ধরিয়া অপর হাতে বাটি তুলিয়া

এক নিশ্বাসে সমস্ত দুধটা নিজে খাইয়া ফেলিয়া বাটিটা দূরে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল।

নৃত্যকালী হাসিয়া গড়াইতে গড়াইতে বলিল—আ মর পোড়ারমুখী, তুই দিনকের দিন পাগল হচ্ছিস নাকি, ছেলের দুধটা খেয়ে ফেল্লি, আমি এখন খোকাকে কি খাওয়াই বল ত ?

এতক্ষণে তরঙ্গিণী নিশ্বাস লইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া নৃত্যকালীর পা ধরিয়া বলিল—দিদিগো, সয়তানীদের কথা শুনে দুধে আমি বিষ দিয়েছিলাম তোমায় খাওয়াব বলে। তার ফল আমি হাতে হাতে পেলাম। দিদি তোমার খোকাকে তুমি বাঁচাও।

নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি খোকার গলায় আঙুল দিতেই খোকা যে দু ঝিনুক দুধ খাইয়াছিল তুলিয়া ফেলিল। সুস্থ সবল খোকা অল্পক্ষণ একটু অবসন্ন হইয়া থাকিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু ডাক্তারের চেষ্টাতেও তরঙ্গিণী বাঁচিল না। তরঙ্গিণী অজ্ঞান হইয়া পড়িতে পড়িতেও ক্ষীণকণ্ঠে একবার জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, খোকা বাঁচবে ?

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর ভূমিলুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া

লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাঁচবে তরি বাঁচবে। তুইও বেঁচে উঠে তোর খোকাকে তুই নে, আমি আর তোর খোকার ভাগ নেব না।

তরঙ্গিণী আশ্বস্ত হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ। দিদি, তোমার খোকা, তোমারই রইল! আমার অপরাধ ক্ষমা কোরো! পায়ের ধূলো দাও দিদি! একবার ওঁকে ডাক, পায়ের ধূলো নেব!

এমন সময় মাসিমা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল—ওরে তরু রে, এ কি সর্ব্বনাশ হল রে!

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর দিকে বিষাবিষ্ট ম্লান দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—আঃ দিদি! ওদের এখান থেকে দূর করে' দাও!



রামধনের কীর্ত্তি

রামধন মণ্ডল বরিশালের কোনো ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করে। দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সে অজ্ঞাতনামা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া দশটাকা জলপানী পাইল; এবং কলেজে পড়িতে বরিশালে গেল।

তাহার পিতা তাহাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিত না। অগত্যা তাহাকে ছেলে পড়াইয়া আরো তিনটি টাকা উপার্জ্জন করিতে হইত। সুতরাং জলপানীর টাকাটা দানাপানিতেই ব্যয় করিতে হইত; জলপানী ব্যাপারটার জল্পনা দরিদ্রের মনে স্থান পাইত না।

ত্রিসংসারে তাহার বৃদ্ধপিতা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। মৃত্যু যখন সেই একমাত্র আশ্রয়ও কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেছিল, তখন বালক রামধন বড় কাতর হইয়াছিল। পুত্রকে রুদন্মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ বলিল "বাবা রামধন, ঠিক আমার এই বিছানার নীচে তিনটা বোগ্‌নোভরা পাঁচ

হাজার টাকা আছে, তারাই তোমার সহায় ও আশ্রয় হবে, ভয় কি বাবা। তুমি যদি বুঝে সুঝে চল্‌তে পার, তোমার ভাবনা কি ?"

রামধন মনে করিল, ইহা বিকারের প্রলাপ। সারাজীবন যে অন্নকষ্ট ও বস্ত্রকষ্ট পাইয়া জীর্ণ পর্ণকুটীরে লালিত হইয়াছে, সে একেবারে পাঁচহাজার টাকা প্রাপ্তির কথা প্রলাপ ও স্বপ্ন বলিয়া মনে করিবেই ত।

তথাপি পিতার মৃত্যুর পর কৌতূহলবশে ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া দেখিল, তিনটি পিত্তলের হাঁড়ির মুখে লোহার তাওয়া ঢাকা রহিয়াছে। ঢাকা সরাইতেই বরদ সহস্র-লোচন ইন্দ্রের মতো মুদ্রাগুলির সহিত রামধনের শুভদৃষ্টি হইল। প্রথম প্রণয়প্রসঙ্গভীতা নবোঢ়ার মতো রামধনের অন্তরটা দুরুদুরু করিয়া উঠিল।

রামধন স্থির করিল, এই টাকা লইয়া সে কলিকাতায় গিয়া ভালো করিয়া লেখাপড়া করিবে।

যথা চিন্তা, তথা কাজ। বরিশালের কলেজ হইতে ট্রান্স্‌ফার লইয়া একেবারে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে

গিয়া ভর্ত্তি হইল এবং হিন্দু-হোষ্টেলের ত্রিতলে একা একটি ঘর লইয়া বাসস্থাপন করিল।

রামধন অতি অল্পকালের মধ্যে মহাধনবান বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠিল। সে কলেজের ব্যায়াম বিভাগের চাঁদা দিয়া নিয়মিত ব্যায়াম করিত এবং ব্যায়ামান্তে পেস্তা কিশ্‌মিশ বাদাম আখ্‌রোট চালগুজা সরভাজা পেট ভরিয়া খাইত এবং সঙ্গীদিগকে খাওয়াইত। কারণ ব্যায়ামান্তে পুষ্টিকর খাদ্যাহার শাস্ত্রের ব্যবস্থা!

অহোরাত্রে পাঁচবার চা খাওয়ার জন্য হোষ্টেলময় ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। মৌতাতের সময় প্রসাদপ্রার্থী অনেক বন্ধু জুটিত। বনমালী জলখাবার জোগাইয়া উঠিতে পারিত না; ব্রজঠাকুর চপ্‌ কট্‌লেট ভাজিতে ভাজিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিত; রজনী বেচারার সোডা লেমনেড জোগাইতে দশবার তেতলা উঠানামা করিতে পায়ে বাত ধরিয়া গেল। ভজহরির কুল্পিবরফ এবং বাথ্‌গেটের পাইন্‌এপ্‌ল্‌ পানীয় না হইলে রামধনের সান্ধ্য মজ্‌লিস ভালো জমিত না। প্রত্যহ চার পয়সার মাখনের পাতামোড়া ঠোঙা ঝুলাইয়া ভোজনাগারে যাইত এবং

আপনার পার্শ্ব ও সম্মুখবর্ত্তী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কিয়দংশ বিতরণ করিয়া দিত। এইরূপে রামধনের প্রসার ও খ্যাতি খুব জমিয়া উঠিল।

রামধনের বিশেষত্ব সকল দিকে। হেয়ারকাটার চুল ছাটিত! লেড্‌ল কোম্পানি শার্ট জোগাইত; নৃত্য ধোপা তিন দিন অন্তর কাপড় কাচিত; এবং দন্তমঞ্জন হইতে সাবান এসেন্স পর্য্যন্ত রামধনের চেরিব্লসমের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যাইত।

রামধন যখন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া ফিরিত তখন বামহস্তের দিব্য ইস্ত্রিকরা চক্‌চকে শার্টের কফের উপর বেলফুলের কুণ্ডলিত মালা মৃদু স্নিগ্ধ গন্ধ বিতরণ করিত। শনি-রবিবারে থিয়েটার কামাই যাইত না; এবং বিলাসিনীদিগকে পুষ্পার্ঘ্য দিতে সে মুক্তহস্ত ছিল। ম্যাক্‌বেথ অভিনয় দেখিতে কাহাকেও পুষ্পার্ঘ্য দিবার অবসর না পাইয়া (লেডি ম্যাক্‌বেথকে উপহার দিতে তাহার বোধ হয় সাহসে কুলায় নাই) বিকৃতদর্শন ডাইনী পিশাচীদের শ্রীশ্রীচরণকমলেষু পুষ্পাঞ্জলি দিয়া দর্শকদের রূঢ়হাস্যাহত হইয়া বেচারা বড় ব্যথা পাইয়াছিল; কিন্তু

সে বুঝিয়াছিল "তোমরা সবাই ভালো, কেউবা দিব্যি গৌরবরণ, কেউবা দিব্যি কালো।"

রামধন হোষ্টেলে আসার পর অনেককে মনিব্যাগের বন্ধন বড় একটা খুলিতে হইত না। কিন্তু রামধনের ব্যাগ অনাসক্ত নিত্যমুক্ত হইয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হইতেছিল। এবং বনমালী, ব্রজ, রজনী ও ভজহরির ট্যাঁক যে পরিমাণে ভারী হইতেছিল, ঠিক সেই অনুপাতে শ্রীমান রামধনের ব্যাগ লঘু হইতেছিল।

রামধন দেখিল যে তৎপঠিত রসায়নশাস্ত্রে টাকার উবায়ু সংজ্ঞা না থাকিলেও, টাকা নিতান্ত উবায়ু। বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে পঞ্চসহস্রের মধ্যে পঞ্চশত মুদ্রা রহিল কি না সন্দেহ। তখন রামধন ধার লইতে আরম্ভ করিল। বাজারে তাহার নামডাক যথেষ্ট। প্রথম প্রথম বেশ ধার মিলিতে লাগিল।

কলেজের বেতন, হোষ্টেলের খাই খরচ, পরীক্ষার ফি প্রভৃতি অবশ্য নগদ দেয় বিষয়ে খরচ করিতে করিতে অবশিষ্ট অর্থও শীঘ্র নিঃশেষের অভিমুখী হইল।

তখন বনমালী, ব্রজ, রজনী, ভজহরি, নৃত্য প্রভৃতি

পাওনাদারেরা তাগাদা আরম্ভ করিল। তাগাদা প্রথমে অনুরোধ, তৎপরে অনুযোগ, অবশেষে আস্ফালনে পরিণত হইল। প্রথম প্রথম বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কিছু কিছু হাওলাত লইয়া পাওনাদারদের থামাইল। কিন্তু অবশেষে বন্ধুদের নিকটও ঋণ দুষ্প্রাপ্য হইল।

চারিদিকে শাণিত-তাগাদা-শরবর্ষী চতুর্দ্দশ রথীতে আক্রান্ত হইয়া বেচারা রামধন একদা রাত্রে যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া একেবারে শিয়ালদহ ষ্টেসনে এবং সেখানে প্রথম চলিষ্ণু ট্রেন ডায়মণ্ড-হারবারের দেখিয়া একখানা টিকিট কিনিয়া তাহাতেই সওয়ার হইয়া একেবারে ডায়মণ্ড-হারবার গিয়া উপস্থিত হইল। বেচারা পুলিশের ভয়ে এবং কি এক অজ্ঞাত সঙ্কোচে লোকালয়ে যাইতে পারিল না। গ্রামের বাহিরে এক বনের মধ্যে একটা অতি উচ্চ দেবদারুর ঘনকুঞ্চিত পত্রান্তরালে লুকাইয়া রহিল; সমস্ত দিন অনাহারে ভয়ে ভয়ে কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখিল এক বৃদ্ধ গলায় টুঁটি-আঁটা মালা পরিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গ ডেড্‌লেটার-আপিশ-ফেরত চিঠির মতো নানাবিধ ছাপে ভরিয়া, সেই গাছের তলায় উপস্থিত

হইল। সে ভয়ে ভয়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল; কিন্তু রামধনের সৌভাগ্যক্রমে উপরে চাহিল না। চারিদিক জনহীন দেখিয়া বৃদ্ধ বস্ত্রান্তরাল হইতে একটা কাপড় মোড়া পুলিন্দা বাহির করিয়া ভূমিতে রাখিল, তারপর সেই দেবদারু বৃক্ষটার পাদদেশে একটা ছোট শাণিত খোন্তা দিয়া ত্রস্তহস্তে একটা গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেই পুলিন্দাটা প্রোথিত করিল এবং গর্ত্তটিকে বেশ করিয়া ভরিয়া দিয়া তাহার উপর একটা আশ্‌শেওড়ার গাছ রোপণ করিল এবং সেই গাছের আশ-পাশে ঘাসের চাপ্‌ড়া বসাইয়া দিয়া বৃদ্ধ স্থানটিকে যথাসম্ভব নিঃসন্দেহ করিল। তৎপরে পাছে তাহার নিজের স্থান ভুল হইয়া গোলমাল উপস্থিত হয় বলিয়া সেই স্থানটাকে চিহ্নিত করিবার জন্য খোন্তার কোণ দিয়া দেবদারু-গাত্রে ত্বক্‌ কাটিয়া লিখিল 'ইহ্'।-

বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিল। রামধন বৃক্ষচূড় হইতে যখন দেখিল যে বৃদ্ধ বহুদূরে চলিয়া গেল, তখন সে বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া দেবদারুর একটা শাখা ভগ্ন করিয়া তৎসাহায্যেই সেই গর্ত্তের উপরকার আল্‌গা মাটি খুঁড়িয়া বৃদ্ধপ্রোথিত পুলিন্দাটি বাহির করিয়া লইল।

এবং পকেট হইতে রজর্সে'র একখানা ছুরি বাহির করিয়া সেই পুলিন্দাজড়ানো মোমজমা কাপড়ের সেলাই কাটিয়া ফেলিল। কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইল একটা টিনের চোঙ। টিনের চোঙের ঢাকনি খুলিয়া বাহির হইল একটা লম্বা মোটা বাঁশের চোঙা। চোঙার ভিতরে দেখা গেল কতকগুলি করেন্সি নোট। সেগুলি দেখিয়া রামধন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; নিমজ্জমান ব্যক্তির আশ্রয় লাভের মতো সে সেই চোঙাটিকে দ্বিগুণ আগ্রহে চাপিয়া ধরিল। আশা আশ্বাসে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। রামধনের অদৃষ্টে গুপ্তধন-প্রাপ্তিযোগ যথেষ্টই ছিল।

রামধন নোটগুলিকে সজ্জিত করিয়া পূর্ব্ববৎ চোঙার মধ্যে গুপ্ত করিল, এবং ছুরি দিয়া বৃক্ষগাত্রে বৃদ্ধের লেখার সঙ্গে ত্বক্ কাটিয়া লিখিল—

ইহা গুপ্ত কেহ,
বিপন্ন দুরূহ,
নিল এই প্রাণ
শোধ্য পেলে দিন।

তৎপরে রামধন গ্রামে প্রবেশ করিয়া এক বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিল এবং কথাপ্রসঙ্গে সেই তিলকমালাধারী বৃদ্ধের পরিচয় জানিয়া লইল।

বৃদ্ধের নাম জগন্নাথ, জাতিতে স্বর্ণবণিক, ধর্ম্মে পরম বৈষ্ণব। সে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল, কিন্তু দুই দুর্বৃত্ত অনাচারী মদ্যপ পুত্রের অসাবধান ব্যয়ে বৃদ্ধের অবস্থায় ভাঁটা লাগিয়াছে, ইত্যাদি।

রামধন বুঝিল পুত্রের কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই এই ধনগুপ্তি।

রামধন পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বৃদ্ধের বাড়ী গেল এবং বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়া, তাহার করুণকাহিনী শুনিয়া, বহু সমবেদনা ও আশ্বাস দিয়া, বৃদ্ধকে পরম আপ্যায়িত করিয়া আসিল।

রামধন কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী ভাড়া করিয়া একেবারে হোষ্টেলে আসিয়া উপস্থিত। তাহার পলায়নে হোষ্টেলময় হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল; তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে হোষ্টেল সন্ধ্যাকালের কাকসমাকুল বটবৃক্ষের মতো, লোষ্ট্রাহত মধুচক্রের মতো মুখর

ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ আসিয়া 'হ্যাণ্ড্‌শেক' করিল, কেহ পিঠে চাপড় কষিল, কেহ নমস্কার করিল, কেহ কুশল জিজ্ঞাসা করিল। শ্রীমান্ রামধন তাহার চিরায়ত্ত হাস্যে সকলকে প্রীত-আপ্যায়িত করিয়া আপনার কক্ষে আসিয়া দেখিল, তাহার দ্রব্যাদি সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিল যে পাওনাদারদের নালিশ অনুসারে সমস্ত দ্রব্যাদি হোষ্টেলের আপিস-ঘরে লইয়া রাখা হইয়াছে, এবং অদ্য বেলিফ আসিয়া প্রকাশ্য নিলামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ টাকা ঋণানুপাতে সকল পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। ইহা শুনিয়া রামধন অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, স্বর্ণ চশ্‌মার স্বচ্ছ অন্তরালে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "ফোঃ স্ক্রাউণ্ড্রেলস! ফাই আন্‌গ্রেটফুল্ ব্রুটস্! তারা আমাকে এত ছোটলোক মনে করে?"

কেহ কেহ তাহাকে 'এড্‌ভাইস্ গ্রাটীস্' দিল যে, পাওনাদারেরা যে-রকম চটিয়াছে তাহাতে তাহাদিগকে সহজে তুষ্ট করা যাইবে না। অতএব কোনো 'ডেঞ্জার্ ব্রেভ' না করিয়া তাহার 'গা-ঢাকা' দেওয়াই ভালো।

রামধন হাসিয়া তাহার সদ্যোদ্গত গুম্ফে একটা পাক দিয়া প্রভুত্বের ভাবে বলিল, "মেক্ ইওর্‌সেল্‌ভস ইজি, মাই ডিয়ার্ ফ্রেণ্ডস্, আই অ্যাম্ কোয়াইট্ এ ম্যাচ্ ফর্ দেম্।" তারপরে চোঙার মধ্য হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচন বন্ধুদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সন্মুখে ধরিয়া রামধন বলিল, "ডোণ্ট ইয়ু থিঙ্ক্ আই য়্যাম্ ওয়েল্ ইকুইপ্‌ট্।"

তখন 'হিপ্ হিপ্ হুরে' এবং 'থ্রি চিয়ার্স ফর্ রামধন-বাবু' শব্দে (তখন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি প্রচলিত হয় নাই) হোষ্টেল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

রামধন তাহার বিস্মিত জিজ্ঞাসু বন্ধুদিগকে বুঝাইল যে তাহার অলস কর্ম্মবিমুখ পাজি নায়েবটা জমিদারী হইতে ঠিক সময়ে টাকা পাঠায় নাই বলিয়াই ত এত অনর্থ। সে নিজে গিয়া তাহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিয়া এই টাকা লইয়া আসিয়াছে। ইত্যাদি।

রামধন সেইদিন সমস্ত পাওনাদারদের সতিরস্কার দেনা দিল। বন্ধুগণ দেখিয়া আনন্দিত হইল যে, 'রামধন-বাবু অনারেব্‌লী অ্যাকুইটেড্।'

রামধন বন্ধুবর্গকে পরিতোষ করিয়া ভোজ দিল। সে দিন ভজহরি পঁচিশ টাকার রোজবেরি-রসগোল্লার কুল্‌পি-বরফ বিক্রয় করিয়াছিল।

রামধন এক্ষণে ঠেকিয়া শিখিয়া বিশেষ মিতব্যয়ী ও সংযমী হইল। সে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া এফ-এ কোনো গতিকে পাশ করিল। কিন্তু তদনন্তর বিশেষ মেধাবী কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছাত্র বলিয়া তাহার নূতনতর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইল। সে এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া হাইকোর্টের উকিল বিশ্বম্ভর বিশ্বাসের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিল এবং শ্বশুরের আশ্রয়চ্ছায়ে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিল

রামধন বিবাহলব্ধ ও শ্বশুরদত্ত টাকা বাঁধিয়া একদিন ডায়মণ্ডহারবার অভিমুখে যাত্রা করিল।

ডায়মণ্ডহারবারে গিয়া বুড়া জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। বুড়া ত কাঁদিয়াই আকুল। তাহার হরিনামের ঝুলি রামধনের

মাথায় বার বার ঠেকাইয়া কত রকম শুভকামনা ও আশীর্ব্বাদ করিল।

ক্ষণেক পরে কিঞ্চিৎ সংবৃত হইয়া বলিতে লাগিল—

"আমার গুণধর ছেলেরা আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ ও নষ্ট কর্‌ছিল ব'লে বৃদ্ধবয়সের অভাবের দিনের জন্যে আমি সেই পাঁচহাজার টাকা সেই দেবদারুর তলায় লুকিয়ে রেখে এসেছিলাম। তখন আমার থলি শূন্য দেখে এক ছেলে অন্যত্র চুরি করে' জেলে গেল; এবং অপরজন মদ খেয়ে একজন স্ত্রীলোককে খুন করে' দ্বীপান্তরে গেছে। অন্য ছেলেটাও যদি দেশছাড়া হয়ে দ্বীপান্তরে যেত ত আমি একবারে নিশ্চিন্ত হতে পার্‌তাম। যা হোক তবু কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয়ে অর্থের সন্ধানে গিয়ে দেখ্‌লাম সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ গলায় চাদর বেঁধে সেই দেবদারুরই ডালে ঝুলে সকল দুশ্চিন্তা, সমস্ত যন্ত্রণার অবসান কর্‌তাম; কেবল তোমার লেখা—

'ইহ গুপ্ত কেহ,
বিপন্ন দুরূহ,
নিল এই ঋণ,
শোধ্য পেলে দিন।

আমাকে আশা ও আশ্বাস দিয়ে অকাল অপমৃত্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা করেছিল। এই 'শ্লোকের 'ঋণ' ও 'শোধ্য' এই দুটি কথা দুই বন্ধুর মতো আমার দুই কানে ক্রমাগত আশা ভরসা সান্ত্বনা আশ্বাস দিতে লাগ্ল। সেই দুটি কথার পরামর্শ-মতো আমি অপেক্ষা করে' আছি ; এবং দারিদ্র্য-অনশন-ঋণে বিবিধ কষ্টভোগ ক'রেও অজ্ঞাত ঋণীর নিরন্তর শুভকামনা ও সুমতি প্রার্থনা করেছি। বাপধন, তুমি আমারই ঐকান্তিক প্রার্থনাতে এত বড়, এত সুশীল হয়েছ। যদি আশ্বাস দিয়ে না যেতে, তবে বৃদ্ধের মনস্তাপে পলে পলে দগ্ধ হয়ে তুমি অধঃপাতে যেতে, একথা নিশ্চয়।"

রামধন হাসিয়া অপ্রতিভভাবে ক্ষমা চাহিয়া সুদসমেত ঋণ শোধ করিল। তখন বৃদ্ধ জগন্নাথ রামধনকে উকিল জানিয়া তাহা দ্বারা এক উইল প্রস্তুত করাইল।

সমস্ত অর্থ গৃহপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ৺শ্যামসুন্দরের দৈনিক সেবার ব্যয়ে নিয়োজিত হইবে। পুত্রদ্বয় গৃহপ্রত্যাগত হইলে পৈতৃক গৃহে বাস-অধিকার পাইবে এবং প্রত্যহ দুই বেলা শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পাইবে মাত্র। সম্পত্তির ট্রাষ্টি ও একজিকিটার নিযুক্ত হইলেন অন্য দুই জনের সহিত হাইকোর্টের সুশীল ধর্ম্মাত্মা উকিল শ্রীযুক্ত বাবু রামধন মণ্ডল।

কব্‌র্‌-ই-আশক্‌

সূক্ষ্মস্রোতা সর্‌বৎ নদী তুর্কিস্থানের মরুপ্রান্তরে সর্‌বৎ সদৃশ স্বাদু নীরধারা ঢালিয়া দিয়া সাগরে গিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। সরবৎ নদীর সিকতাময় পুলিন বেষ্টন করিয়া উত্তরে আখ্‌লাৎ গিরিমালা। গিরিসানুতে দ্রাক্ষাকুঞ্জ, খর্জ্জুরবীথি। দক্ষিণকূলে শুধু সিকতার সীমাহীন বিস্তার, মাঝে মাঝে পেস্তা চালগুজা প্রভৃতির ক্ষেত্রের হরিৎ শোভা। আখ্‌লাতের কোলে আদানা গ্রাম; আখ্‌লাতের শীর্ষ-বিস্রুত সরা নির্ঝরিণী আদানার বুক চিরিয়া নহর বহিয়া সর্‌বৎ নদীতে গিয়া মিশিয়াছে। আদানা যেন বাঘাম্বর গঙ্গামৌলী মহেশের মতো গম্ভীর সৌন্দর্য্যে মনোরম।

আমির আস্মন এই প্রদেশের অধিপতি। আদানায় তাঁহার পল্লীভবন। তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর; ক্রুর আরব মরুর মধ্যে মধুচরিত্র শ্যামদ্বীপ। দিব্য গৌর,

উন্নত, পেশীপুষ্ট দেহ; পুষ্পপ্রফুল্ল কোমল মুখশ্রী; অংসবিলম্বী দীর্ঘ কুঞ্চিত বাবরি চুল; পরিচ্ছদ সহজ সুন্দর; দৃঢ়চরিত্র, নিষ্ঠাবান।

গুল্‌সুরৎ তাঁহার একমাত্র বেগম। গুল্‌সুরৎ বাস্তবিকই "গুল-সুরৎ"। তাঁহার স্বামীর আদরের ডাক "গুল্‌-গুলাব"। বাস্তবিক সে গোলাপ ফুলের মতোই সুন্দর; —গোলাপের লালিমা তাহার ওষ্ঠে ও গণ্ডে; গোলাপের কোমলতা তাহার দেহে ও মনে; গোলাপের গন্ধ তাহার চরিত্রে ও ব্যবহারে; গোলাপের কণ্টক কুর্দ্দিস্থানের ঈর্ষাকাতর সুন্দরীদের চিত্তে।

গুল্‌সুরৎ স্বামীতে নির্ভরশীলা, তাহারই উদ্যানে স্বহস্তবর্দ্ধিত শ্যামালতাটির মতো; সকলের প্রতি বিশ্বাস-পরায়ণা কপোতীর মত; অজ্ঞাতপ্রচ্ছন্নগুণা কস্তুরী মৃগের মতো; প্রকট চিত্তসৌন্দর্য্যে গুপ্তদেহশ্রী কাঁঠালীচাঁপার মতো। সে প্রজ্ঞাবান চরিত্রবলী স্বামী পাইয়া গর্ব্বিতা নহে, ধন্যা; স্বামী তাঁহার মতো ফুলটি পাইয়া মুগ্ধ।

আদানা হইতে প্রায় এক ক্রোশ তফাতে গুল্‌সুরতের এক ভগ্নীর বাড়ী। তাহার নাম নুরনেহার। নুরনেহার

গুল্‌স্থরতের ভগ্নী অপেক্ষা সখীর স্থান অধিকার করিয়াছিল। সূর্য্যের স্বর্ণ আভা সরার উচ্ছল জলে যখন সান্ধ্য-লালিমা দান করিত, যখন আখ্‌রোট-বাদামের ফুলের গন্ধে আদানা মত্ত হইয়া উঠিত, যখন বুলবুল দেওয়ানা হইয়া পড়িত; তখন গুল্‌স্থরৎ ঔৎসুক্য-ক্ষুব্ধ চিত্তে ভবন-জালায়ন মুক্ত করিয়া অপেক্ষা করিত, কখন তাহার বহিন নুরনেহার কুব্জপৃষ্ঠ উষ্ট্রের উপর দূর প্রান্তরে দেখা দিবে। ফিরোজা রঙের রেশমী বোর্‌কা ভেদ করিয়া উৎসুক সখীর চঞ্চল দৃষ্টি গুল্‌স্থরৎ মনশ্চক্ষে অনুভব করিত; আপনার স্বাগতদৃষ্টি বহিনের প্রতি প্রেরণ করিত; উষ্ট্র হেলিয়া দুলিয়া দ্রুত চলিত।

একদিন বৈকালে আমির আম্মন ভোজন-ভবনে বৈকালিক আহারের জন্য আসিয়াছেন। ঘরটি 'কম্‌খাব'-আচ্ছাদিত; তাহার উপর গজ-দন্ত-নির্ম্মিত মেজের উপর মখ্‌মলের আস্তরণ; তাহার পার্শ্বে স্বর্ণরঞ্জিত বিচিত্র কারুচিত্রিত কেদারা, তদুপরি আমির আম্মন উপবিষ্ট। ঘরের চারিদিকে বড় বড় জানালা; জানালার উপর সূক্ষ্ম মস্‌লিনের পর্দা জানালাগুলিকে অর্দ্ধাবৃত করিয়া

রাখিয়াছে; প্রতি বাতায়নাবকাশে একজন বাঁদি. দণ্ডায়মানা'; তাহাদের নীল পেশোয়াজ, সবুজ ওড়না, লম্বিত বেণী, মেহদিরঞ্জিত হস্ত, কজ্জললিপ্ত চক্ষু; সুন্দরী-দের বিচিত্র বসনে বৈকালিক রৌদ্র ঝিকিমিকি খেলিতেছে; দক্ষিণ বায়ু ব্যস্তসমস্ত ভাবে বাতায়নের আচ্ছাদনী ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া যুবতীর ওড়না উড়াইতেছে, আতরের গন্ধে আকুল হইয়া ছুটিয়া পলাইতেছে। বাঁদির হাতে থাঞ্চাভরা মিষ্টান্ন, কাহারো হাতে রৌপ্যপাত্রে নানাবিধ মেওয়া, কাহারো হাতে সরবৎ, কাহারো হাতে গোলাপপাশ, কাহারো হাতে আতরদান, কাহারো হাতে ময়ূরপুচ্ছের ব্যজন। গুল্‌সুরৎ স্বামীকে আহার্য্য বিতরণ করিতেছে। তাহার আস্‌মানি রঙের পেশোয়াজ, ফিরোজা রঙের ওড়না, স্বর্ণখচিত জরির জুতা, মস্তকের লম্বিত বেণী বেষ্টন করিয়া মুক্তামালা, চোখের কোণে সুর্মা টানা, হাতের তলে জাফ্‌রাণের রং, গণ্ডে ওষ্ঠে অনিন্দ্য স্বাস্থ্যের লালিমা; বৈকালের রৌদ্র যখন তাহার দেহ-চুম্বনের অবকাশ পাইতেছিল তখনই হাসিয়া উঠিয়া চক্ষে ঝিলিক হানিতেছিল, গুল্‌সুরতের গণ্ডের লালিমা

গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল। গুল্‌সুরতের সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে স্বামীকে আহার করাইতে ব্যস্ত, কিন্তু আমির আম্মনের কৌতূহলী চক্ষু সে শোভায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। গুল্‌সুরৎ গোলাপের সর্‌বৎ, মেওয়া ও মিষ্টান্ন একে একে স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করিতেছিল, স্বামীর ভোজন-শেষ পাত্র উঠাইয়া বাঁদিদের হাতে দিতেছিল।

যখন আহার আরম্ভ হইল, তখন গুল্‌সুরৎ ওড়্‌নাখানি গুটাইয়া লইয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া বসিল এবং গজদন্ত-মণ্ডিত ময়ূরপুচ্ছের সন্দলী পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। আম্মন প্রেয়সীর সরবৎ-মধুর স্নিগ্ধ রূপধারায় অতৃপ্ত, গোলাপী সর্‌বৎ তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। তিনি প্রিয়ার কিশলয়কোমল মসৃণ সুন্দর ছোট্ট হাতখানি ধরিয়া বলিলেন, "তোমার বহিনের আসার সময় হইয়াছে?"

গুল্‌সুরৎ বলিল, "না, এখনো আসার সময় হয় নি। ঐ দেয়ালের রৌদ্রচিহ্ন যখন ঐখানে উঠিবে, তখন হেনা ফুটিবে, বুলবুল ডাকিবে, আমার বহিনের উট পেস্তার ক্ষেতে দেখা দিবে।"

আম্মন প্রেয়সীর বর্ণনাবহুল কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তোমার বহিনের এখানে আর না আসাই ভালো; হয় তাহার আগমন বন্ধ করিতে হইবে, নয় তো আমাদের আদানা ছাড়িতে হইবে।"

গুল্‌সুরৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার প্রিয়সখী ও বহিনের প্রকৃতি মধুর; সে তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিল?"

আম্মন কতকগুলি পেস্তা ও কিস্‌মিস একত্র করিয়া মুখে দিয়া বলিলেন, "তোমার বহিন আমার সঙ্গে আশক করিতে উৎসুক।"

এই কথাতে গুল্‌সুরৎ বসোরার গোলাপ-ক্ষেতকে লজ্জা দিয়া হাস্য করিয়া কহিল, "বহিনের স্বামীর প্রতি আস্‌নাই হওয়া ত স্বাভাবিক। যে আমাকে ভালোবাসে, তাহাকে তোমাকে ভালোবাসিতে মানা কর না কি?"

আম্মন আব্‌জোসের বীচি ফেলিয়া বলিল, "না, তা বারণ করি না, কিন্তু বেশি ভালোবাসিয়া ফেলিলেই বিলক্ষণ ভয় হয়, কারণ তোমার স্বামী একটি বই ত নয়।"

এই কথাতে গুল্‌সুরৎ "যাও" বলিয়া স্বামীর গায়ে

ঢলিয়া পড়িয়া একটু ছোট রকম ধাক্কা দিল; আম্মনের অঙ্গুলিধৃত আঙুরটি মাটিতে পড়িয়া অভিমানে ফাটিয়া গেল।

দু'জনের হাসিকে বাধা দিয়া নুরনেহার বলিয়া উঠিল, "তোমাদের আনন্দের শরিক আসিয়াছে।"

গুল্‌সুরৎ হাসিতে হাসিতে উঠিয়া ভগ্নীর হাত ধরিল।

* * *

পরদিন প্রাতে আম্মন একখানি পত্র স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার কথা সত্য কি না।"

গুলসুরৎ পড়িতে লাগিলঃ—

"হে আমার জান-বেহেস্তের ইঞ্জিল; গুল্‌সুরতের কাছে শুনিলাম যে আমার গোপনপূজা হৃদয়-দেবতার গোচর হইয়াছে। ভালোই। জানাইবার জন্য আমার প্রাণ মধ্যে মধ্যে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। সরলা গুল্‌সুরৎ মনে করে আমি তাহারই প্রেমের আকর্ষণে উটে চড়িয়া, তপ্ত বালুকার প্রান্তর ভাঙিয়া নিত্য আদানায় যাই! কিন্তু খামিন্, তুমি জানিয়াছ, নুরনেহারের চক্ষুর নুর তুমি। এবং আমার নাম অন্বর্থ হইয়াছে শুধু তোমাকে দেখিয়াই। কে আমার

এই গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত করিয়া দিল? বুঝি মনোভব। আজ আমার প্রেম বসন্তের প্রজাপতির মতো বিচিত্রবর্ণের রঙিন্ পাখা মেলিয়া উড়িয়াছে, আয় ইয়ার, তাহাকে তোমার চিত্তপুষ্পের প্রেমমধু পান করিতে দাও। আমি বিধবা, কিন্তু তুমি আমার ভগ্নীপতি হইলে কেন? জানি আমি, বহিন গুল্‌সুরৎ তোমার স্ত্রী থাকিতে তুমি আমায় নেকাহ করিতে পার না। কিন্তু, তবু—তোমার প্রেম না পাইলে আমার প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইবে। তুমি গুল্‌সুরতের প্রেমে মশ্‌গুল্, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে এমন প্রাণপ্লাবী প্রেম কোথায়? আমার মতো রূপ সে কোথায় পাইবে? সে কি আমার বাঁদি হইবার যোগ্য? যদি দয়া হয়, তোমার বাগানে বৈকালে আমায় দেখা দিয়ো, আমার অনেক কথা বলিবার আছে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তোমায় যদি সেখানে না পাই তবে বুঝিব আদানায় আমার কবরেরও স্থান হইবে না। একটি ত্বদর্পিত প্রাণা রমণীর শুভাশুভ তোমার উপর নির্ভব করিতেছে জানিয়ো। ফকত।

অভাগিনী নুরনেহার।'

পত্র পাড়তে পড়িতে গুল্‌সুরতের গণ্ড বাহিয়া ধারা

বহিল, যেন বসোরার গোলাপ-ক্ষেত্রে বারিবর্ষণ হইতেছে; জলভরা চোখ দুটি স্বামীর মুখের উপর তুলিয়া গুল্‌সুরৎ বলিল, "খামিন্, কি হবে? নুর্‌নেহার আমার বহিন না হইলে তোমায় সাদি করিতে বলিতাম। আমায় তালাক দিলে বিবাহ হয়, কিন্তু আমি তোমায় ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব! তুমি ও নুর্‌নেহার আমার যে তুল্য প্রিয়।"

আম্মন বলিলেন, "প্রেয়সি, একনিষ্ঠতাই হজরৎ মহম্মদের অনুমোদিত, তাহা কি ভুলিয়া গেলে? যে আপন দোষে দুঃখকে ডাকিয়া আনিয়া আপনার চিত্তদুর্গ অধিকার করিতে দেয়, তাহার দুর্গতি দেখিয়া কষ্ট বা শোক করা বৃথা। খোদা বহিনকে শুভমতি দান করুন!"

আম্মনের ভবন-সন্নিহিত উদ্যানের বাদামতলায় অন্ধকার জমাট বাঁধিতেছে। আখ্‌রোটের গাছে আঙুরের লতা বেড়িয়া উঠিয়াছে, একটা বুলবুল লতার শাখায় ঝুলিয়া একটা আঙুরে এক-একবার চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে আর এক-একবার মুখ উঁচু করিয়া সুধাসিক্ত কণ্ঠে মধুর শিশ দিয়া উঠিতেছে। পুষ্পবহুল বসন্তে হেনা বকুল চামেলি ও

গোলাপের গন্ধে সান্ধ্যসমীরণ ভারাক্রান্ত হইয়া মৃদু বহিতেছে। উদ্যানের মধ্যে পাষাণ-বেদিকা বিদীর্ণ করিয়া সরার জল ফোয়ারা হইয়া রূপার তারগুলির মতো জলধারা তমসাচ্ছন্ন শূন্যে প্রেরণ করিতেছে; সে জল নীচে পড়িয়া নহর বহিয়া, সর্পবৎ নদীতে গিয়া মিশিতেছে। সরার বুকে সান্ধ্য সূর্য্যের শেষ স্বর্ণাভা নিভিয়া গেল। আম্মন ও গুল্‌সুরৎ ভবন-জালায়ন হইতে অস্পষ্ট দেখিলেন, পুষ্পবিতানের মধ্য হইতে বাহির হইল নুরুন্নেহার; আজ তাহার বোর্‌কা নাই, গুণ্ঠন নাই; ফেরোজা রঙের পেশোয়াজ, গোলাপী ওড়্‌না, পৃষ্ঠে দোদুল্য বেণী;—দীপ্ত সৌন্দর্য্য উদ্যানে যেন দাবাগ্নি জ্বালিয়াছে।

নুরুন্নেহার একবার চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া লইল। প্রাসাদের দিকে চাহিয়া একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, তারপর কাঁচি দিয়া বেণী কাটিয়া ফেলিল, চোখের সুর্‌মা মুছিয়া ফেলিল, হাতের কুঙ্কুমরাগ নহরের জলে ধুইয়া ফেলিল, ওড়্‌না পেশোয়াজ ফেলিয়া মোটা বোর্‌কায় গুণ্ঠন টানিল। তারপর—পরিত্যক্ত প্রসাধন একত্র করিয়া রাখিল। তারপর—দক্ষিণমুখে বদ্ধাঞ্জলি

হইয়া দাঁড়াইয়া ভূলুন্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। তারপর— ধীরে ধীরে খর্জ্জুরবীথির অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

আম্মন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নুরুন্নেহার গৃহে ফিরিল না, বোধ হয় মক্কায় কাবাতে আপনাকে উৎসর্গ করিতে গেল।"

এতক্ষণ গুল্‌সুরৎ নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল, এখন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বিষাদিত দম্পতি একটি শামাদান হাতে লইয়া বাগানের উদ্দেশে বাহির হইলেন

আম্মন পরিত্যক্ত পোষাকের উপর একখানি কাগজ দেখিয়া উঠাইয়া লইয়া শামা'র আলোতে পড়িলেন, নুরুন্নেহারের প্রার্থনা :—

"এই আদানায় আমার সকল গর্ব্ব, সকল মোহ, সকল পাপের কবর হউক। রে সয়তান, আমাকে আর প্রলুব্ধ করিও না। হে পরমেশ্বর, মানুষের প্রেম আকর্ষণে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তোমার প্রেম লাভেও যেন বঞ্চিত না হই। আমার চিত্ত, হে সোভান্ আল্লা, তোমার প্রেমে পবিত্র হউক।"

আম্মন! সে লিপিখানি মস্তকে রাখিয়া বলিলেন, "আমেন"। বিষাদিত দম্পতি মক্কার দিকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিলেন। গুল্‌সুরৎ বহিনের কর্ত্তিত বেণী ও পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ একটি অশ্রুসিক্ত স্বর্ণপেটিকায় সযত্নে রাখিয়া দিল। তাহার উপরে মিনার কাজে লিখিত হইল "কবর্-ই-আশক্"।

প্রেমের নিরিখ

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভীমা ও নীরা নদীর সঙ্গমক্ষেত্রে মহেন্দ্রবিদার নগরে রাজা দ্রোণায়ণ রাজত্ব করিতেন। দ্রোণায়ণ রাজ্যলোলুপতার জন্য সমস্ত রাজন্যবর্গের ভীতি ও অশ্রদ্ধার কারণ হইয়াছিলেন।

গজেন্দ্রগড়ের রাজা মল্লশূরই কেবল তাঁহাকে প্রতি-হত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অকালে মল্লশূরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বালকপুত্র পুষ্পহাসের রাজমন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন।

দ্রোণায়ণ কণ্টক দূর হইয়াছে মনে করিয়া পরম উল্লসিত হইলেন; এবং গজেন্দ্রগড়-রাজপরিবারের অশৌচান্ত না হইতেই মহারাজ মল্লশূরের রাজ্য আক্রমণ করিলেন।

ঝল্লকণ্ঠ প্রভুরাজ্য রক্ষার জন্য সসৈন্য দ্রোণায়ণকে বাধা

প্রদান করিলেন। এই যুদ্ধে দ্রোণায়ণের প্রধান সহায় এবং সহচর ছিলেন তাঁহার পুত্র ভদ্রমুখ এবং কন্যা ভদ্রসোমা।

ঝল্লকণ্ঠ যখন সমরাঙ্গণে নিশিত বাণ ত্যাগ করিতেছিলেন, তখন পুষ্পধন্বার তির্য্যক্‌কৃত ধনু ভদ্রসোমার কুঞ্চিত ভ্রূতল হইতে দুই চারিটি খরকটাক্ষবাণ ছুটিয়া আসিয়া ঝল্লকণ্ঠের হৃদয়ে বিশেষভাবে আঘাত করিয়া গেল।

দৈনিক সমরাবসানে যখন ঝল্লকণ্ঠ আপন শিবিরে সান্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে "তদ্বিষ্ণুর পরমপদ"-স্থলে ভদ্রসোমার ব্রীড়াবীর্য্যবিঞ্জিত ফুল্ল মুখকমল বারংবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি কাতর হইয়া ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিলেন—"হে মা ভবানী, একি হইল মা? চিরশত্রুর সহিত এ প্রীতি-সম্বন্ধস্থাপনের লালসা মনে কেন উদয় হইল? যাহাকে শরবিদ্ধ করিতে হইবে, তাহার চরণনিম্নে আপনার হৃদয় পাতিয়া দিতে সাধ হইতেছে কেন? যাহার হৃদয়রক্তে কর্ত্তব্যের তর্পণ করিতে হইবে, তাহারই চরণতল আমারই

হৃদয়রক্তরাগে রঞ্জিত করিতে বাসনা হইতেছে। হে মদনদহন, আমায় বল দাও, এই চিত্তবিক্ষোভ প্রশান্ত কর—”

উপাসনা শেষ হয় নাই, দ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল—বিপক্ষশিবির হইতে জনৈক দূত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

তাঁহার উপাসনা শেষ হইল না। কি এক অব্যক্ত কারণে মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুষ্পধন্বা কত মধুময় আশার কথা কানে গুঞ্জরণ করিতে লাগিল। প্রবল বাসনাঝঞ্ঝা ক্ষীণ সংযমচেষ্টাকে কোথায় উড়াইয়া দিল। তিনি দূতকে প্রবেশের আজ্ঞা দিলেন।

দূত আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। কম্পিত হস্তে আবরণ উন্মোচন করিয়া পড়িতে লাগিলেন—

“স্বস্তি শ্রী সমরবিজয় শ্রীঅভিনন্দিত গজেন্দ্রপুরাধীশ্বর-সচিবশ্রেষ্ঠ-ঝল্লকণ্ঠ-শ্রীকরকমলোপায়ন-পত্রিকা—

“সমরকুশলী বীরশ্রেষ্ঠ, আবাল্য যে আদর্শীকৃত বীরমূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে পূজা করিয়াছি, তাহা আজ আপনাতে

শরীরী দেখিলাম। শক্রকন্যার পূজোপচার গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। নিবেদন ইতি—রাজকন্যা ভদ্রসোমা।"

ঝল্লকণ্ঠ হর্ষাতিবেগস্তম্ভিত-হৃদয়ে লিপিখানি বারংবার পড়িতে লাগিলেন। আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস হয় না, আপনার অনুভূতিকে প্রত্যয় হয় না। 'একি সত্য? একি সত্যই সত্য? উপহাস নহে, বিদ্রূপ নহে, ব্যঙ্গ নহে,—প্রকৃত সত্য? পিপাসাক্ষামকণ্ঠ পক্ষী জল চাহিতেই ধারাপ্রবাহ মুখে আসিয়া পড়িল? আজ আমি প্রকৃত জয়ী—রমণীর চিত্তজয় শতসাম্রাজ্য জয়ের তুল্য! আমি ধন্য, আমি জয়ী।'

ঝল্লকণ্ঠ রাজকন্যা ভদ্রসোমাকে উত্তর লিখিলেন—"মন্মথমৈত্রীবশীকৃতা রাজকুমারী ভদ্রসোমা-শ্রীকরকমলোপহৃতা-পত্রিকা—

"ভদ্রে, আপনি মন্মথের পুষ্পধনুর সম্মোহন শর! আজ আমি জিত কি জয়ী ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার আনন্দ যেন আমার নিত্যোপভোগ্য হয়! নিবেদন ইতি— মুগ্ধ ঝল্লকণ্ঠ।"

পরদিন মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠের প্রস্তাবক্রমে উভয়পক্ষে সন্ধি

হইয়া গেল। রাজা দ্রোণায়ণ মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠের সহিত কন্যা ভদ্রসোমার উদ্বাহ অঙ্গীকার করিলেন, এবং মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ বাধাপ্রদানের ভানমাত্র করিয়া ক্রমে ক্রমে গজেন্দ্রগড় রাজ্যের বহুলাংশ দ্রোণায়ণকে অধিকার করিতে দিবেন, এইরূপ গুপ্ত অঙ্গীকার স্বীকার করিলেন। কামোপহতচেতা ঝল্লকণ্ঠ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন।

২

নীরা ও ভীমা নদীর সঙ্গমসম্মুখে রাজকুমারীর পুষ্প-বাটিকা! নীলাঞ্জনদ্যুতি ক্রীড়াশৈলের প্রত্যন্তদেশে সুরম্য কদলীকুঞ্জ, তন্মধ্যে মর্ম্মরশিলাপট্ট বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র পুষ্পতরুর পদতলবাহিতা ক্ষীণা নির্ঝরিণীর রজতসূত্রধারা নীরার নির্ম্মল ক্রোড়ে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছিল। শয়নীয়-স্নিগ্ধশিলাপট্ট-সমাসন্না ভদ্রসোমা ভূষণশিঞ্জিত হস্ততালে তাঁহার প্রিয় ময়ূরটিকে নাচাইতেছিলেন; আর তাঁহার সখী পুষ্পিলা অশোকপলাশের মালা গাঁথিয়া তাঁহার শিরোমুকুট গড়িয়া দিতেছিল। অশোকপলাশের রক্তস্তবক শুভললাটে পড়িয়া দেবকন্যা উষার ললাটতিলক অরুণের মতো শোভা পাইতেছিল। শ্রুতি-আশ্রিত

মুক্তাগুচ্ছে সেই পুষ্পলালিমা প্রতিফলিত হইয়া শ্রুতিমূলে বিচিত্র পত্রলেখা রচনা করিতেছিল। গুঞ্জন্মধুপপুঞ্জ কেলিকুঞ্জে ব্রততীবলয়াসঞ্জনা কুরুবকশাখা হইতে কপোত-বধূর করুণধ্বনি কি এক তরল বিষাদ বর্ষণ করিতেছিল; সহসা মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ সেখানে উপস্থিত হইলেন।

কপোতবধূ উড়িয়া গেল; করকিশলয়তালমুগ্ধ নর্ত্তামান ময়ূর সংবৃতনৃত্য হইয়া উড়িয়া গিয়া বকুলবৃক্ষে বসিল; সখী পুষ্পিলা সরিয়া দাঁড়াইল; রাজকন্যা ময়ূরকণ্ঠী বসন-খানি অঙ্গে টানিয়া দিয়া, চলিত দুকূলের সূক্ষ্মসুবাসে কদলীবিতান পূর্ণ করিয়া, অবনতমুখী হইয়া দাঁড়াইলেন তাঁহার মুখভাবে লজ্জাসম্ভ্রমের রেখামাত্র অঙ্কিত হয় নাই, বুঝি বিরক্তিমিশ্রা ঘৃণার ব্যঞ্জনা ব্যক্ত হইয়াছিল। তবু ভাবমুগ্ধ ঝল্লকণ্ঠ সেই লীলাচতুরার তদবস্থ ভাব দেখিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছিলেন।

কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, ভদ্রসোমা আপনাকে উন্নত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "মন্ত্রিন্, এ পুরস্ত্রীর কেলিকুঞ্জ! রাজনীতিজ্ঞের উপযুক্ত স্থান নহে।"

ঝল্লকণ্ঠ হাসিয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,

"ছলকোপনে, আমাকে আসিবার অধিকার দিয়াছ, তাই আসিয়াছি। প্রেমময়ি, আবেগাতিশয্যহেতু যদি আচারের অতিক্রম করিয়া থাকি, অনুগত জনকে ক্ষমা কর, আমি তোমারই।" সস্বেদপুলককম্পিতাঙ্গ মন্ত্রী দুই পদ সরিয়া ভদ্রসোমার হস্তধারণের উপক্রম করিলেন।

রাজকন্যা পুচ্ছবিমর্দ্দিতা সর্পিণীর মতো গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিন্, পুরন্ধ্রীর অমর্য্যাদা করিবেন না।"

ঝল্লকণ্ঠের বীরহৃদয়ও এই তর্জ্জনে সঙ্কুচিত কম্পিত হইয়া উঠিল। তিনি বিনীতকণ্ঠে বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি উৎসাহ দিয়াছিলেন বলিয়া এই ধৃষ্টতা করিতে সাহসী হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সত্য রক্ষা করিয়া আমাকে আপনার প্রেমের অধিকার প্রদান করুন।"

ভদ্রসোমা পূর্ব্ববৎ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "মন্ত্রিন্, বীরত্ববিমুগ্ধচিত্তার শ্রদ্ধা যদি অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন, আমায় ক্ষমা করিবেন; আমি সম্পূর্ণ আপনার অযোগ্যা,—যুদ্ধান্ত-প্রশান্তবুদ্ধিতে ইহা এখন আমি বুঝিতেছি। আমি আপনার ধৃষ্টতা যেমন মার্জ্জনা করিলাম, আপনিও আমার প্রগল্ভতা মার্জ্জনা করিবেন।"

বাক্‌হত ঝল্লকণ্ঠ একবার সেই লাবণ্যবিচ্ছুরিত মুখের দিকে চাহিলেন; সেখানে অটলতা শাণিত খড়্গের মতো উদ্যত দীপ্ত রহিয়াছে, সেখানে করুণাশ্রদ্ধার লেশমাত্র নাই। ঝল্লকণ্ঠ ধীরে ধীরে কদলীকাননের মধুরশীতল ছায়া হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিরহতপ্ত হৃদয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল তপ্ত পথে চলিয়া গেলেন।

ঝল্লকণ্ঠ চলিয়া গেলে ভদ্রসোমা পুষ্পমুকুট ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; মনোজ্ঞকূর্পাসকপীড়িতস্তনা খেদবতী আপনার কঞ্চুলিকা ছিন্ন করিয়া তন্মধ্য হইতে ঝল্লকণ্ঠের প্রথম-প্রণয়দূতীকল্পা লিপিখানি বাহির করিয়া, চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া, বিলাপ করিতে করিতে শিলাপট্টের উপর পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া ফুঁপিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

"এস এস ওহে দয়িত, তোমার অপমানক্ষত হৃদয় অশ্রুপ্রলিপ্ত করিয়া দিব; এস ওগো এস দেবতা, প্রেমশ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দনে তোমার পূজা করিব; তোমার পূর্ণ গৌরবে এস গরবী, আমার হৃদয়মন্দিরে, তোমার গৌরবকণিকা স্খলিত হইতে আমি দিব না; এস ওহে এস মনোহর, ওহে সৌম্য, আমার যৌবনবসন্তের প্রথম

পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণে দিব; কোথা যাও, ও গো ফিরে চাও, ওহে দুরন্ত অভিমানী, অবহেলাহত অশ্রুকুম্ভ ভাঙিয়া গিয়াছে—রুদ্ধ কর হে সক্ষম, সে প্রবাহ রুদ্ধ কর; কোথা যাও ও গো ফিরে চাও, ওহে তেজস্বী, আমার অন্তরে আগুন লাগাইয়াছ, স্নিগ্ধ কর, ওহে সন্তাপহর, অন্তর শীতল কর; ওহে প্রাণেশ্বর তুমি ফিরে এস, ওগো ফিরে এস।

অয়ি কঠোর, যশঃ কিল তে প্রিয়ং
কিম্ অযশো নন্থ ঘোরম্ অতঃপরম্।
কিম্ অভবদ্ বিপিনে হরিণীদৃশঃ
কথয় নাথ কথং বত মন্যসে॥"

রাজকন্যার বিলাপে ব্যথিতচিত্তা সখী পুষ্পিলা দৌড়িয়া গিয়া হৃদয়ভারে মন্থরগতি ঝল্লকণ্ঠকে ধরিয়া বলিল, "মন্ত্রিবর, রাজকন্যা আপনার জন্য কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, আপনি আসুন, ওগো সত্বর আসুন।"

ঝল্লকণ্ঠ শশাঙ্কদর্শনোচ্ছ্বসিতহৃদয় সাগরের মতো উল্লাস-বিদ্রুতগতিতে কুঞ্জদ্বারে আসিয়া দেখিলেন, বিলুণ্ঠন-বিশ্লথবেশা ভদ্রসোমা করুণক্রন্দনে তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছেন।

ভাববিহ্বল প্রীতিপ্রফুল্ল ঝল্লকণ্ঠ স্নেহস্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "প্রেয়সি, আমি আসিয়াছি, ওগো দেখ, আমি প্রেমের অর্ঘ্য রচনা করিয়া চরণোপ্রান্তে আসিয়াছি—উঠ হৃদয়েশ্বরি, উঠ।"

বাক্‌কশাহতা কোপস্ফুরিতাধরা রাজকন্যা ত্বরিত উঠিয়া সংবৃত হইয়া বলিলেন, "তুমি কেন ওগো, এখানে কেন? যাও যাও তুমি চলিয়া যাও। অপমানের উপর অত্যাচার সংযোগ করিয়ো না। যাও তুমি লৌকিকাচারচঞ্চুর, চলিয়া যাও। এখানে ওগো মন্ত্রী, তোমার কোনো কাজ নাই, কোনো কর্ত্তব্য নাই।"

বিস্মিত অবাক ঝল্লকণ্ঠ পুনরায় নিঃশব্দে বাহির হইয়া রমণীচিত্তের জটিল রহস্য জল্পনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। সখী পুষ্পিলা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভদ্রসোমা আবার শিলাপট্টের উপর বিলুণ্ঠিত হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন,—

"এলে যদি, তবে যাও কেন, ওহে চিরবাঞ্ছিত—তুমি আপনার পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমার চিত্ত-

ক্ষেত্রে খেলা কর। ওহে দুর্লভ, তোমায় পাইয়া আবার হারাই কেন? ওগো বল্লভ, অশিথিলপরিরম্ভে আমাকে গ্রহণ কর।”

৩

প্রত্যাখ্যাত ঝল্লকণ্ঠ পত্র লিখিলেন :—

“ভদ্রে, অজ্ঞান-অনিচ্ছা-কৃত যদি কোনো পাপ করিয়া থাকি, যথেষ্ট শাস্তিভোগ করিয়াছি,—ক্ষমা কর, আমায় রক্ষা কর। ইতি—ত্বদর্পিতপ্রাণ ঝল্লকণ্ঠ।”

দূত রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিল—রাজকুমারী পত্রোত্তর দেন নাই।

রাজকুমার ভদ্রমুখ ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন “ভগ্নী সোমা, প্রণয়বিহ্বল সন্ধিমিত্র সচিব ঝল্লকণ্ঠকে কেন নিগৃহীত করিতেছ? তোমার রূপগুণমুগ্ধ ঝল্লকণ্ঠ তোমার সম্পূর্ণরূপে যোগ্য পাত্র।”

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “তিনি আমার যোগ্য হইতে পারেন, কিন্তু আমি বুঝিতেছি যে আমি তাঁহার যোগ্যা নহি। তাঁহাকে আমার অস্থির প্রগল্‌ভতা ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন।”

ব্যর্থদৌত্য রাজকুমার ফিরিয়া গেলেন।

ভ্রাতাকে বিদায় দিয়া ভদ্রসোমার বাহ্যতকঠোরপ্রতীত প্রতীপগামী চিত্ত কাঁদিয়া উঠিল—

"ওগো! প্রেম যদি আসে, তবে যোগ্যতা লইয়া আসে না কেন? মন্মথমথিতমন যাকে চায়, তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় না কেন? দোষ গুণ বিচারের প্রবৃত্তি আসে কেন? জগৎটা এই বিরাট 'কেন' সূত্রে প্রতিচ্ছন্ন,—ইহার মীমাংসা হইল না, বুঝি হইবে না।"

রাজা দ্রৌণায়ণ স্বয়ং আসিয়া কন্যাকে বলিলেন, "বৎসে সোমা, সহসা একি বাতুলতা? ঝল্লকণ্ঠ তোমার পরিবর্ত্তে আমাকে বিশাল রাজ্যের অধিকার দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। বারংবার ব্যর্থীকৃত সর্ব্বপ্রচেষ্টা অনায়াসে সফল হইতেছিল, তুমি একি অনর্থপাত অকস্মাৎ আনয়ন করিলে? বালচাপল্য ত্যাগ কর; ঝল্লকণ্ঠকে বিবাহ করিতে স্থিরমতি হও; তোমার বালসুলভ নির্বুদ্ধিতার জন্য আমি হস্তগত বিশালরাজ্য ত্যাগ করিতে পারি না; তোমায় ঝল্লকণ্ঠকে বরণ করিতেই হইবে।"

রাজকুমারী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "পিতা, রাজ-

শাসন চিত্তদমন করিতে নিতান্ত অক্ষম। কন্যার চিত্ত বিক্রয় করিয়া রাজ্য অধিকার না হয় নাই করিলেন।”

পিতা বিফলচেষ্ট হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে ভদ্রসোমা কাঁদিয়া উঠিল— “হায় হায়, চিত্ত যদি রাজশাসনেও দম্য হইত। আমার এ বিদ্রোহী চিত্তকে দমন করিতে কি প্রকৃষ্ট বাহুশক্তি বর্ত্তমান নাই? ওগো কে বলিয়া দিবে, প্রেম ও কর্ত্তব্যের জীবনান্তক যুদ্ধ কিসে বিরামলাভ করিবে —বিজয়লক্ষ্মী একপক্ষ অভিনন্দিত করুক,আমার চিত্ত শান্ত হোক। বিষমঝটিকাবিক্ষুব্ধ জলধিতরঙ্গের মতো বিপরীত ভাবশ্রেণী আমার হৃদয়-বেলায় নিরাশ্রয়ভাবে আছাড়িয়া দুধারি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে; ওগো বিধাতা, শান্ত কর, ওহে শান্তি দেও। প্রগ্রহে অশ্বের মতো সবলে হৃদয়কে টানিতেছি; জানি না তাহাতে কতগুলি তন্তু ছিঁড়িয়াখুঁড়িয়া যাইতেছে।”

৪

মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ আনায়ত্তীকৃত প্রভুরাজ্য দ্রোণায়ণ রাজার নিকট ফেরত চাহিলেন। রাজ্যলোলুপ দ্রোণায়ণ প্রথমত যেন শুনিলেন না; তারপর যেন ভালো বুঝিলেন না;

তার পর ইতস্তত করিলেন; তারপর বলিলেন, "আমার কন্যা সম্প্রদান করিতে তো প্রস্তুতই আছি, আপনি তাহাকে সম্মত করুন।" বারংবার বিফলপ্রযত্ন নিরাশ্বাস ঝল্লকণ্ঠ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, রাজ্যাধিকার ফিরাইয়া চাহিলেন।

তখন দ্রোণায়ণ বলিলেন, "স্বায়ত্তীকৃত রাজ্য কোন্ নির্ব্বোধ ত্যাগ করে। আমি উহা ত্যাগ করিব না।"

ঝল্লকণ্ঠ বলিলেন, "সামর্থ্য থাকে ফিরাইয়া লইব।"

দ্রোণায়ণ বলিলেন, "সেই ভালো।"

ঝল্লকণ্ঠ বৈরনিশ্চিত হইয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

৫

অপমানোদ্বেজিত ব্যর্থ প্রণয়লালস ঝল্লকণ্ঠ উদ্বোধিতোস্রোশৌর্য্যসাহায্যে উপর্য্যুপরি যুদ্ধে পরাজিত করিয়া রাজা দ্রোণায়ণের কঠিন কবল হইতে সমস্ত নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিলেন। উদ্ধারব্রতে ব্যয়িত সমস্ত অর্থ স্বসঞ্চিত অর্থ হইতে দিয়া প্রায়শ্চিত্তশুচি তপঃক্লশ যাজ্ঞিকের মতো দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইলেন। তৎপরে রাজকোষ হইতে অর্থ লইয়া দ্রোণায়ণের রাজ্য যুগপৎ তিন স্থানে আক্রমণ করিলেন।

দ্রৌণায়ণ এই অনুতাপদৃপ্ত প্রায়শ্চিত্তপ্রয়াসী মন্ত্রীর দুষ্প্রধর্ষ আক্রমণ আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। বারংবার পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন।

ঝল্লকণ্ঠ স্বশিবিরে বসিয়া আছেন। বিজয়ীর প্রায়শ্চিত্তশুদ্ধ ললাটে চক্ষে সন্তোষের জ্যোতি স্ফুরিত হইতেছিল। কুঞ্চিত কেশকলাপ আবেষ্টন করিয়া লাবণ্যবিচ্ছুরিকা মুক্তামালা বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্যের মতো শোভা পাইতেছিল। ক্রোড়ন্যস্ত কোষবদ্ধ কৃপাণ বিজয়ীর শান্তনিরুদ্বেগ প্রচার করিতেছিল। এবং ভদ্রসোমার প্রথম লিখিত একখানি-মাত্র পত্র অনিমেষনয়নে দেখিতে দেখিতে তিনি ভাবিতে-ছিলেন—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥"

তাঁহার চিন্তায় বাধা পড়িল। দ্বাররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল, "দ্রৌণায়ণ-রাজকুমার ভদ্রমুখ সন্ধিদূত হইয়া

আসিয়াছেন।" ঝল্লকণ্ঠ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে, ভদ্রমুখ বলিলেন, "আপনার স্বরাজ্য আপনি পাইয়াছেন, এক্ষণে আর বিরোধ কেন? সন্ধি করিয়া শান্তি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিতে আমরা ইচ্ছুক।"

ঝল্লকণ্ঠ বলিলেন, "রাজকুমার, আপনারা ইচ্ছুক হইতে পারেন, কিন্তু আমি ইচ্ছুক নহি। আমি যে উদ্বেগ ও ক্ষতি স্বীকার করিয়াছি তাহার পূরণ ও প্রতিশোধ আমি চাই।"

"তবে এই লও প্রতিশোধ" বলিয়া ভদ্রমুখ গুপ্ত কৃপাণিকা আমূল ঝল্লকণ্ঠের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন।

এমন সময় দ্বাররক্ষক প্রচার করিল; "রাজকুমারী ভদ্রসোমার দূত আসিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণায় কাতর ধ্বনি নিঃসৃত হইতে হইতে ক্ষান্ত হইল। কেহ জানিল না মন্ত্রীর কি সাংঘাতিক অবস্থা হইয়াছে। তিনি সকল কষ্ট ভুলিয়া

আবেগোচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কই, কই, সে দূত কই? তাহাকে শীঘ্র আসিতে দাও।"

রাজকুমারীর দূত জজ্জিযল প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীকে শোণিতাপ্লুত লুণ্ঠিত দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার চীৎকারে বহুলোক সমবেত হইয়া মন্ত্রীকে তদবস্থ দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল।

মন্ত্রী সকলকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিয়া, বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলে অপসৃত হইলে জজ্জিযলকে নিকটে আহ্বান করিলেন।

দূত নিকটস্থ হইয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ, এ কার্য্য কে করিল?"

মন্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, "অদৃষ্ট!—উপলক্ষ্য রাজকুমার ভদ্রমুখ।"

জজ্জিযল বলিল, "কেন কেন, তাঁহার এ দুর্ম্মতি কেন হইল? বীর হইয়া এই গুপ্তহত্যা-প্রবৃত্তি কেন জন্মিল?"

ঝল্লকণ্ঠ কষ্টনিঃসৃত কণ্ঠে বলিলেন, "এও অদৃষ্ট!—কর্ত্তব্যভ্রষ্ট আমি নিজের স্বার্থের জন্য প্রভুরাজ্য বিক্রয় করিয়াছিলাম;—সে প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিয়াও প্রতিহিংসা-

প্রবৃত্তি আমাকে উত্তেজিত করিয়াছিল;—বীর শত্রুর প্রার্থিতসন্ধি উপেক্ষা করিয়া অদৃষ্টের প্রতিদান এই পাইয়াছি।—যাক সে কথা, এক্ষণে তুমি কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, শীঘ্র বল—আমার সময় সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে।”

জজ্ঝিল আপনার উষ্ণীষাবরণ হইতে একখানি পত্র মুক্ত করিয়া ঝল্লকণ্ঠের হাতে দিল।

ঝল্লকণ্ঠ সেই চন্দনকুঙ্কুমলিপ্ত সুগন্ধী লিপিখানি লইয়া চোখের কাছে কিছুক্ষণ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মৃত্যুচ্ছায়সমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে লিপিখানির একটি বর্ণও পড়িতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বুকে ললাটে চাপিয়া ধরিয়া চুম্বনাচ্ছন্ন পত্রখানি জজ্ঝিলকে দিয়া বলিলেন, “জজ্ঝিল, ভগবান আমাকে প্রেয়সীর হস্তাক্ষর দর্শনসুখেও বঞ্চিত করিয়াছেন; শ্রবণশক্তি অবিকৃত থাকিতে থাকিতে তুমি ইহা পাঠ কর; আমার দৃষ্টিতে আবিল্য আসিতেছে, মৃত্যুর প্রাণহীন শীতলহস্ত আমার সর্বেন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করিতেছে, সমস্ত মসীলিপ্ত দেখিতেছি,—তুমি পত্র পাঠ করিয়া শুনাও, শীঘ্র পাঠ কর।”

অজ্জিল আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিল—

"স্বধর্ম্মকর্ত্তব্যনিষ্ঠ গরিষ্ঠ সচিবশ্রেষ্ঠ ঝল্লকণ্ঠ শ্রীকর-কমলোপায়ন— "ওহে দয়িত, ওহে বাঞ্ছিত, ওহে বল্লভ, তোমাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট স্বার্থান্ধ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, পুটপাকপ্রতীকাশা অন্তর্গূঢ় ঘন-ব্যথা হৃন্মর্ম্মে অস্ফুটিত ব্রণের রূঢ় গ্রন্থির ন্যায় ঘনীভূত শোক নিশিদিন বিষদিগ্ধ শল্যের মতো জ্বালা দিয়াছে। তোমার আত্মোপলব্ধি তোমাকে সগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দেখিয়া আজ আমার কৃত্তখণ্ডনব্যথ চিত্ত তাহার সমস্ত রুদ্ধ পূজা দিয়া তোমাকে অভিনন্দন করিয়া স্বাধিকারে আবাহন করিতেছে ;—এস ওগো গৌরবদীপ্ত সুন্দর, ফিরে এস ; ওহে হৃদিরঞ্জন, হৃদয়মন্দিরে ফিরে এস ; ওগো প্রত্যাখ্যাত, দ্বারোপান্ত হইতে ব্যর্থমনোরথ লইয়া ফিরিয়া গিয়া, ওহে প্রাপ্তসর্ব্বগৌরব বীরশ্রেষ্ঠ, আমার চিত্তরাজ্য জয় করিয়াছ, তোমার স্নেহচ্ছায়ে উহাকে পালন কর। আমার মানস-আদর্শ তোমার ব্যবহারে কলঙ্কম্লান হইয়াছিল, আজ তোমার প্রায়শ্চিত্তপূতচরিত্র তাহাকে রাহুমুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় উজ্জলতর, ভাস্বরতর করিয়াছে—আমার মানসমুকুরে

তোমার গৌরবমুকুটের দীপ্তচ্ছায়া দেখিবে, এস ওগো এস। আমার অটল বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে পূর্ব্বকার সরল কোমল স্নেহবন্ধন অটুট অক্ষুণ্ণ ও প্রীতিযোগ অপরাজিত রহিয়াছে। ওহে হৃদয়দেবতা, আমার সর্ব্বরচিত বিচিত্র অর্ঘ্য তোমার চরণে ঢালিয়া দিব, এস ওহে ফিরে এস। ইতি—পূজার্থিনী ভদ্রসোমা।”

পত্র পঠিত হইলে ঝল্লকণ্ঠ মরণরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, “জম্ভিল, আমার হইয়া তুমি রাজকন্যাকে বলিয়ো, আমি বলিতেছি—‘দেবি, মূঢ় আমি,—তোমায় পাইবার উপায় ভুল বুঝিয়া কর্ত্তব্যপথক্ষুণ্ণ হইয়া তোমায় পাইয়াও পাই নাই।—মূঢ়তানুষ্ঠিত পাপ তোমার জন্যই করিয়াছিলাম—ইহাই আমার সান্ত্বনা। তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়াছ,—আমাকে তোমার পূজাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ,—ইহা জানিয়া মরিতেও সুখ—মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সর্ব্বগ্লানিহরা লিপিখানি আমার মৃত্যুসরণি সরল সুন্দর করিয়া দিল।—আমি ধন্য—আমি আজ সার্থকপ্রেম।—জম্ভিল, আমি আজ এই মৃত্যুমুহূর্ত্তে আমার অস্খলিত প্রীতির নিদর্শন কি দিব; তাঁহার প্রথম প্রণয়সম্ভাষমধুরা লিপিখানি আমার

বক্ষে নিশি দিন রক্ষা করিয়াছি—তাহাই লইয়া তাঁহাকে দিও।”

এই বলিয়া ঝল্লকণ্ঠ অঙ্গরক্ষণীরে বন্ধনমুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, জজ্জিমল সসম্ভ্রম তৎপরতায় তাঁহাকে সাহায্য করিল। অঙ্গরক্ষা উন্মুক্ত করিয়া ঝল্লকণ্ঠ দেখিলেন, বক্ষবিদ্ধ কৃপাণিকা পত্রখানির একাংশ ছিন্ন করিয়া বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে। তিনি সেই ছিন্ন রক্তানুলিপ্ত পত্রখানি চুম্বন করিয়া জজ্জিমলের হাতে দিলেন; তার পর বক্ষ হইতে সবলে কৃপাণিকাফলক নিষ্কাসিত করিয়া জজ্জিমলকে দিয়া বলিলেন :—

“যাও জজ্জিমল্—আমার হৃদয়রক্তরঞ্জিত কৃপাণিকা তাঁহাকে দিয়া বলিয়ো, ‘এই কৃপাণিকা আমার শত্রু হইয়াও হিতকারী—সে প্রেয়সীর প্রণয়ানুপ্রাণিত হস্তাক্ষর আমার বুকের মধ্যে পূরিয়া দিয়াছে,—প্রেয়সীর প্রণয়গর্ভ বাণী আমি হৃদয়ে বহন করিয়া মরিব,—আমাকে কেহ আর তাহা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না,—আমি সার্থক প্রেমের পুষ্পক্রোড়ে মরিতেছি।—আমি সুখী।—ভগবান, পরকালে অপরিণত প্রণয়প্রসঙ্গ যেন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়,

প্রারম্ভমাত্রসাঙ্গলীলা ভদ্রসোমাকে সান্ত্বনা দিয়ো—হে ভগবান—"

বক্ষের ক্ষতমুখে রক্তোচ্ছ্বাস হইল, মরণরুদ্ধ মন্ত্রী ঝল্লকণ্ঠ শয্যায় অসাড় জড় পতিত হইলেন।

প্রত্যাবৃত্ত জল্লিল প্রণয়প্রাণ মন্ত্রীর সকল বাক্য যথাযথ নিবেদন করিয়া প্রগাঢ়শোকোদ্বেগস্তম্ভিতা রাজকুমারী ভদ্রসোমার চরণপ্রান্তে রক্তরঞ্জিত কৃপাণিকা ও পত্রিকা দুখানি রাখিয়া দিল।

ভদ্রসোমার শোক উচ্ছ্বাসাতীত, অননুমেয়, অগাধ; রক্তলিপ্ত উপহারগুলি দেখিয়া অক্ষিকোণে শুধু দুটি বিন্দু লাবণ্যবিচ্ছুরিত অশ্রু নিটোল মুক্তাফলের মতো দীর্ঘ নিরন্ধ্র পক্ষ্মাশ্রয়ে দুলিয়া উঠিল; তিনি রক্তলিপ্ত পত্রিকার একখানি মস্তকে কবরীর মধ্যে, অপর খানি বক্ষাবরণান্তরালে রক্ষা করিলেন; তার পর, দয়িতহৃদয়রক্তরঞ্জিত কৃপানিকাখানি চুম্বন করিয়া ললাটে মস্তকে স্পর্শ করিলেন; সীমন্তে ললাটে রক্তরাগদীপ্তি সধবার প্রিয়ানুরাগচিহ্নিত সিন্দুরশোভার মতো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সেবিকা

গৌড়নগরনিবাসিনী শ্রীমতী কুলীনকন্যা, কুলীনপত্নী, কৌলীন্যের(অন্যতম প্রথম বলি। শৈশবে জ্ঞানবিকাশের পূর্ব্বেই সামাজিক উপদ্রব বিবাহ নামক একটা উপসর্গ তাহার জীবনে জুটিয়াছিল; কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সজ্ঞানে এক দিনের জন্যও স্বামী নামক অপূর্ব্ব জীবের শ্রীপদারবিন্দ-সন্দর্শন তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

স্বামীদেবতা বিস্মৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, কাল তাহাকে ভুলিয়া ছিল না। কালে ফুল্ল যৌবনশ্রী তাহার নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল; পুষ্পস্তবক-বিভূষণা নবমল্লিকার মতো তাহার তনুলতা শ্রীসম্পদে দীপ্ত হইয়া উঠিল। নয়নে অলসমদিরভাব, চরণে সবিলাস গতি, সর্ব্বাঙ্গে সরমসঙ্কোচ জাগিয়া উঠিল; মানসক্ষেত্রে মনোভব সমরতাণ্ডবে নাচিয়া উঠিল। সামাজিক শাস্ত্র প্রতিনিয়ত তাহার কর্ণরন্ধ্রে স্বামীদেবতার বিচিত্র মাহাত্ম্যের

দুন্দুভিনিনাদ করিতে থাকিলেও, বিষমসমরবিজয়ীর বিজয়নিশান প্রণয়াকাঙ্ক্ষা বিচিত্র বিভাবে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

একদা বিহঙ্গসঙ্গীতনন্দিত পুষ্পবহুল বসন্তের অরুণিত প্রভাতে সে দেখিল গঙ্গাস্নাত কৌষেয়পরিহিত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী হাতে সাজি ধরিয়া পূজার জন্য পুষ্পচয়ন করিতেছে; নবারুণের লালিমদ্যুতি তিলকত্রিপুণ্ড্রক-চর্চ্চিত প্রশান্ত প্রশস্ত ললাটে মহেশের শশীনেত্রের মতো জ্বলিতেছে। পুষ্পবনে দীপ্ত স্থলপদ্মের মতো তাহাকে দেখিয়া শ্রীমতীর ভ্রমরকৃষ্ণ চক্ষু চঞ্চল হইল, মনোভব হাসিল, শ্রীমতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—

'তুমি কে, তুমি কে গো, এই দীপ্ত প্রভাতে পুষ্পবনে অরুণের মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছ? তোমার বৈদ্যুতশক্তি যে আমার অন্তরের অন্তরে প্রসৃত হইয়া পড়িল। একি, ওগো এ কি! আমার প্রাণে আজ মধুপঝঙ্কৃত শত শতদল বর্ণগন্ধগানে এক সঙ্গে কেন ফুটিয়া উঠিল? এস, এস, ওহে শতদলবিহারী আমার অন্তরে এস, ভাব-রাগ-বাক-তানে তোমার পূজা করিব, এস এস হে।'

শ্রীমতী দাবদগ্ধা হরিণীর মতো সর্ব্বসন্তাপহা শীতল জাহ্নবীজলে গিয়া পড়িল, তবু চিত্তজ্বালা নিভিল না। 'শিবায় নমঃ' বলিয়া ফুল দিতে গিয়া 'গোবিন্দায় নমোনমঃ' বলিয়া অন্তরবিজয়ীর পূজা করিল। শ্রীমতী গহন মাঝে দিক্‌বিদিক্ হারা হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—

'হে ভগবান, এ কি করিলে, এ কি হইল ? গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে আবাল্য কতদিন কতবার দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এ কি কুক্ষণে বা সুক্ষণে সে আমায় দেখা দিল ? হে অন্তর্যামী, তার মধ্যে আজ এমন কি ঐশ্বর্য্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে তাহাকে আজ অতুল শোভায় সজ্জিত দেখিলাম ; অথবা হে বিধাতা, আমার মনেই কি এমন কিছু অঘটন ঘটনা ঘটিল যাহাতে সে আজ আবাল্যদৃষ্ট অবিশেষকে সবিশেষ শোভন করিয়া গ্রহণ করিল ? এ কোন্ অয়স্কান্তমণি, যাহার স্পর্শে লৌহ কনককান্তি লাভ করিল, এ কোন্ স্পর্শমণি যাহার সংসর্গে মৃৎপিণ্ড রত্নদ্যুতি বিকীর্ণ করিল ? ও গো এ কি, কি এ ?'

শ্রীমতীর চিত্তবিপ্লব গোবিন্দের অন্তরে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। গোবিন্দ বুঝিল, মনোভব সররভাবের

দিব্য সরণি নির্ম্মাণ করিয়া উভয়ের চিত্তসংযোগ সাধন করিয়াছেন। গোবিন্দের প্রাণও কাঁদিল—

'হে মনোমথ, তোমার এ কি খেলা? তোমার মোহনস্পর্শে আমার চিত্তে যে অসংখ্য ভাবকুসুম প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, হে অঘটনঘটনপটু, তাহা সার্থকতা লাভ করিবে কোথায় হে, ওহে কেমন করিয়া?'

এক্ষণে মন্মথ যদি বাদ সাধিল, তবে তাহাদের সহজ দৃষ্টিমিলন প্রথমে চকিত হইল, ক্রমে সলজ্জ, অবশেষে করুণ হইয়া উঠিল। যখন দুটি প্রাণ প্রণয়ের আকর্ষণে পরস্পরাভিমুখী হয়, তখন কি জানি কেন আন্তরিক নৈকট্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে দূরত্ব আসিয়া পড়ে।

এক্ষণে শ্রীমতীর স্বামীদেবতার কাল্পনিক পদারবিন্দ অপেক্ষা তাহার প্রতিবেশী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ফুল্ল মুখারবিন্দ অধিক তৃপ্তি সান্ত্বনা ও স্বর্গ সুখের আভাস দিতে লাগিল।

পল্লীধুরন্ধরগণের ইহা বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না— প্রণয়ের ধর্ম্মই প্রকাশ। কটাক্ষ বিদ্রূপ তিরস্কার তাহাদের সঙ্কুচিত দুটি প্রাণকে সহানুভূতির গূঢ়স্রোতে অতি দ্রুত

অতি দৃঢ় মিলিত করিয়া দিল। উভয়ে উভয়কে বলিল—

'এস এস ওগো বাঞ্ছিত, আমার নিগ্রহনির্ভিন্নহৃদয়ে তোমার মধুমূরতি বরণ করিয়া লই। তুমি দুঃখরূপে এস আমাকে অধিকার কর, ওগো আচ্ছন্ন কর!'

শ্রীমতীর বিফলপ্রেম রত্নমালার মধ্যমণির মতো গোবিন্দের বক্ষ উজ্জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; গোবিন্দের প্রণয় চন্দনপ্রলেপের মতো শ্রীমতীর জ্বালাময় হৃদয় শীতল করিল।

মিলনের প্রথম উল্লাস ও উন্মাদনা যখন শ্লথ হইল, তখন শ্রীমতী দেখিল, সমাজ সমাজ, সে একের সুখদুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। সে বেশ বুঝিল, তাহাদিগকে নিগৃহীত লাঞ্ছিত গৃহতাড়িত পতিত ঘৃণিত পরিত্যক্ত করিবার বিপুল আয়োজন উদ্যোগ হইতেছে। তখন শ্রীমতী চিন্তা করিতে লাগিল—

'সমাজ, তোমার প্রবল ইচ্ছার কাছে আমরা কি কিছু নহি? হৃদয় প্রেম বাসনা ইচ্ছা স্বাধীনতা বলিয়া কি সম্মানযোগ্য কিছু নাই? আমার চিত্ত যাহাকে চাহে, সে আমার কেহ নয়; তুমি যাহাকে দয়া করিয়া দিবে, সেই

প্রসাদ পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে? আচ্ছা বেশ! প্রবলের জয় হউক! আজ আমি একজনকে ভালো বাসিয়াছি বলিয়া তোমার গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে; এমন দিন আসুক আমার জীবনে, হে ভগবান, যখন সমাজের প্রত্যেককে আমি গোবিন্দের মতো ভালোবাসিব, অথচ লোকে আমার জয়গান করিবে। এখন যাহারা আমায় দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন করিতেছে, তাহারা আমার প্রসাদলাভের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিবে।'

তদবধি শ্রীমতী আত্মসংবরণ করিল।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীমতীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, স্তব্ধ হইল, সম্ভ্রমে মুহ্যমান ও সঙ্কুচিত হইল। যে তাহাকে দেখিয়া শ্রীমতীর তুষারকুন্দেন্দু-মৃণালরজতপ্রভ শুভ্র-শীতল হাসিখানি মেঘবেষ্টনী বিদ্যুতের মতো তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিত, জলবিন্দু লোলচপল দৃষ্টি তাহাকে অভ্যর্থনা করিত, কপোলরাগ অরুণিত হইয়া উঠিত, সেই তাহাকে দেখিয়া সেই শ্রীমতীর মুখের একটি ক্ষুদ্রতম পেশীও বিচলিত হইল না। শুধু চিত্তজয়ের অনবদ্য বিরাট আনন্দ তাহার চক্ষু হইতে চ্ছুরিত হইতে দেখিয়া গোবিন্দ শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে

পুলকাঞ্চিত হইল, মনে মনে শ্রীমতীর সংযমশক্তিকে প্রণাম করিল।

এইরূপে দিন গেল, মাস গেল। আচারের ব্যতিক্রম ঘটিল না। গোবিন্দ শুধু সপ্রশংসদৃষ্টিতে পূজা দান করে; শ্রীমতীর প্রশান্ত দৃষ্টি তাহাকে কি বলে, সে তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না। শ্রীমতীর ... শুধু তরল প্রেম ক্ষরিত হইত, তাহা লইয়া ...রীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, এখন তাহা তাহার একলার নিজস্ব নহে, তাহা সকলেরই, তাহা সাধারণের। সেই অ... ...সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে গোবিন্দ তাহার জন্য বিশেষ কিছু ...া পাইত না,—তবু গোবিন্দ তাহা হইতে নি... প্রীতি লাভ করিত।

সমাজ অগত্যা শান্ত হইল। বুঝি পূতসংযমশীলা শ্রীমতীর কাছে নতি স্বীকার করিল।

শ্রীমতী সর্ব্বদা প্রার্থনা করিত,—' ... তুমি একের প্রীতি সকলকে বাঁটিয়া দিলে; সেই শু... ...র আসুক— সকলে ইহা ভোগ করুক, আমার জীবন সার্থক হোক। তুমি আমার জীবনে সেই শুভ মুহূর্ত্ত আনিয়া দাও, যখন

আমি দ্বিধা-বিরহিত হইয়া সকলকে প্রাণের প্রীতি পরিবেষণ করিয়া দিতে পারি। তুমি গোবিন্দকে আশ্রয় করিয়া প্রীতিরূপে আমার চিত্তমন্দিরে প্রকাশিত হইয়াছিলে, এখন বিশ্বরূপে যদি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, তবে, হে ... সেই বিশ্বরূপের পূজার অবকাশ দাও; ... শরণীয় শ্রেয় ও প্রেয় পন্থা নির্দ্দেশ কর।'

ভ... প্রার্থনা অবশেষে পূর্ণ করিলেন। গৌড়নগরে ... উপস্থিত হইল। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি মৃত্যু ... বলিত হইতে লাগিল। যত সম্পন্ন গৃহস্থ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। শ্রীমতীর পিতা সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় পলায়নের উদ্‌যোগ শেষ করিয়া যখন শ্রীমতী... আহ্বান করিলেন, তখন শ্রীমতী বলিল—

'আমার ...নের শুভ মুহূর্ত্ত আজ আসিয়াছে, ওগো আজ আসিয়াছে। আজ আমি বিশ্বজনের সেবা করিয়া ধন্য হইব, পবিত্র হইব, পূর্ণ হইব। আমার ব্যর্থ জীবন রক্ষার জন্য কেন পলাইব? সেবা-উৎসর্গিত জীবন আমার

সার্থক, ওগো সার্থক হউক। শুভাকাঙ্ক্ষী যে কেহ থাক আশীর্ব্বাদ কর, ওগো আশীর্ব্বাদ কর।'

শ্রীমতী রহিল। আর রহিল নগরত্যাগসক্ষম গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। তাহারা পীড়িত ও আর্ত্তের সেবা ও যত্নে আপনাদিগকে ঢালিয়া দিল।

নিপুণ সেবিকা শ্রীমতী নিত্য দ্বারে দ্বারে ঔষধ ও সেবা লইয়া ফিরে, গোবিন্দ তাহার নিরাপত্ত মূক অনুগত আজ্ঞাবহ। শ্রীমতীর বিশ্বসেবায় যে সুখ, সেবিকার সাহায্যে গোবিন্দের সেই আনন্দ—অনাবিল, অনবদ্য।

যাহারা কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতীকে তাড়িত লাঞ্ছিত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাহার সঙ্গলাভের জন্য অধিক ব্যস্ত। এবং তাহার সাক্ষাৎ পাইলে এখন তাহারা কাতরকণ্ঠে বলে, 'থাক মা থাক, শরীরিণী শুশ্রূষা বিধাতার শুভ আশীর্ব্বাদের মতো আমাদের রোগক্লিষ্ট শিয়রে বসিয়া থাক!'

যাহারা তাহাকে অসতী বলিয়া বিশেষভাবে নাসিকা-কুঞ্চন করিয়াছিল, তাহারাই এখন বলে, 'তুমি পুণ্যবতী, ওগো সতী সাধ্বী।'

ক্রমে গোবিন্দের পালা আসিল। সে রোগগ্রস্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়িল, সে কাতরতা রোগযন্ত্রণায় নহে, শ্রীমতীকে মহৎব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিতে বঞ্চিত হইয়া।

তপিষ্ঠা শ্রীমতী গোবিন্দের শয্যাপার্শ্বে দিব্য প্রশান্ত মুখে আসিয়া দেখা দিল। গোবিন্দ প্রথম মুহূর্ত্তে সুখাতিশয্যে একটু বিচলিত হইল, তাহার ভাবভারী অক্ষিপুট নিমীলিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—

'শ্রী, শ্রী, ওগো শ্রী, তুমি এখানে কেন? কত অনাথ তোমার সেবালাভের জন্য সোৎসুক প্রতীক্ষা করিতেছে; তুমি তাহাদের কাছে যাও, আমার কাছে থাকিয়ো না।'

শ্রীমতীর মুখ সহাস নহে, অথচ প্রদীপ্ত। এ দিব্য শ্রী সেই তপঃক্লিশা কোথায় পাইল? সে অকম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'গোবিন্দ, তুমি মনে করিয়ো না, যে, আমি অধিক প্রীতি লইয়া তোমার সেবা করিতে আসিয়াছি। তুমি নগরের দরিদ্রতম ভিক্ষুক হইলেও এখন আমি আসিতাম; এখন তোমার সেবার পালা; আমার কর্ত্তব্য শেষ হইলেই

অন্তের সেবায় চলিয়া যাইব। গোবিন্দ, হীনতম নাগরিক আমার যতখানি প্রিয়, তুমিও ততখানি, এখন একটুকুও বেশি নও। একটু কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধু তোমার নিকট আছে; ভগবান তোমাকেই উপলক্ষ্য করিয়া আমার রুদ্ধ-চিত্তের গুপ্তভাণ্ডার বিশ্বের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।'

গোবিন্দের মৃত্যুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন চক্ষু প্রশংসা সম্ভ্রম প্রীতি ভক্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল 'ঈশ্বরের করুণা ও প্রেম ধন্য, শ্রীমতী তুমি ধন্য, আর তোমাদের দয়াতে আমিও ধন্য। ঈশ্বরের চরণে কোটি নমস্কার, তোমার চিত্তজয়ের বিরাট শক্তিকে শত শত নমস্কার, দেবি, তোমার অপূর্ব্ব বিশ্বপ্রীতিকে সহস্রবার নমস্কার, সাধ্বি, তোমার চরণে বার বার নমস্কার!'

আবেগ-উত্তেজিত প্রেমিকের উত্থিত মস্তক শয্যায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। শ্রীমতী ডাকিল, 'গোবিন্দ!' মরণাহত প্রেমিক উত্তর দিল না। অবিকম্প অনিস্পন্দ কণ্ঠে শ্রীমতী আশীর্ব্বাদ করিল, 'তুমি আজ ভগবানের

চরণ-সদাব্রতে চিরঅতিথি হইলে, যাও, তোমার আত্মার কল্যাণ হৌক।'

তারপর শ্রীমতী মরণাক্রান্ত অপরগৃহে চলিয়া গেল,—গোবিন্দের জন্য একটি দীর্ঘনিশ্বাসও বুঝি নির্গত হইল না।

চুড়িওয়ালা

"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে।"

দুপুর বেলা যখন রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে, গলির পথে লোক চলিতেছে না, ঘরে ঘরে গৃহিণীরা কাজকর্ম্ম সারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া একটু গ'-গড়া দিতেছেন, তখন নিজের পসরা মাথায় করিয়া পথে পথে চুড়িওয়ালা হাঁকিয়া ফিরিতেছিল—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে।"

গলির ধারে একটি জানলা অল্প একটু খুলিয়া একটি কিশোরী মেয়ে ডাকিল—"ও চুড়িওলা, চুড়িওলা, এই বাড়ীতে এস।"

চুড়িওয়ালা ফিরিয়া দুই হাতে মাথার ঝুড়ি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া উপরে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কনে, কেডা ডাকছ গো?"

কিশোরী বলিল—"এই যে এই বাড়ীতে।"

চুড়িওয়ালা দেখিল একটি তন্বী সুন্দরী কিশোরী একখানা চৌড়া লাল পেড়ে শাড়ীতে মাথায় আধঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে—শাড়ীর চৌড়া লাল পাড়টি মাথার মাঝখানে সিঁদুরের মতো টকটক করিয়া যেন জ্বলিতেছে। কিশোরীর নাকে একটি নোলক, কানে দুটি দুল—গায়ের রঙের সঙ্গে সেগুলি যেন মিশিয়া লুকাইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই বুড়া আলিজানের মনটা খুসী হইয়া উঠিল। এমন মধুর রূপ সে আর কখনো দেখে নাই; অনেক সুন্দরীকে সে চুড়ি বেচিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও দেখিয়া তাহার প্রাণ এত খুসী হইয়া উঠে নাই। সে হাতের বোঝা মাথায় নামাইয়া বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরীটি নামিয়া আসিয়া চুড়িওয়ালার সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"লাল চুড়ি আছে চুড়িওলা?"

চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"আছে মা লক্ষ্মী! কার হাতের চাই? তোমার হাতের?"

কিশোরী ঘাড় কাৎ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

বুড়া আলিজান মাথার মোট নীচে নামাইয়া উপরের ঢাকা খুলিতে খুলিতে হাসিয়া বলিল—"তা লাল চুড়ি ত তোমার ও লাল হাতে মানাবে না মা লক্ষ্মী !—রঙে রঙে মিশে যাবে যে ? ঐ রাঙা হাতে কালো চুড়ি ভালো মানাবে। কালো চুড়ি দেবো ?"

কিশোরী লজ্জায় লাল হইয়া হাসিমুখ নত করিয়া বলিল —"না, লাল চুড়ি বা'র কর।"

বুড়া চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"মা আমার লালির ভক্ত ! এস ত মা হাত দেখি ?"

কিশোরী লজ্জিত হইয়া বলিল—"না, তুমি চুড়ি দাও, আমি দেখে নিচ্ছি।"

চুড়িওয়ালা বলিল—"তোমার হাতে পরায়ে দেবো না মা ?"

কিশোরী বলিল—"না, আমি মার কাছে পরব।"

বুড়া চুড়িওয়ালা হাসিয়া বলিল—"না মা, তা হবে না; ও রাঙা হাতে রাঙা চুড়ি আমি পরায়ে দিয়ে যাব। তা যদি না দাও ত মুই চুড়ি বেচব না"

বুড়া মনে করিতেছিল এই ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সে

ত কত বাড়ীতে কত মেয়ের হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চুড়ি পরাইয়া দিয়াছে। কত স্পর্শ তাহাকে ক্ষণিকের জন্য একটু বিচলিত করিয়াছে, কিন্তু তাহাকে কেহই ত মুগ্ধ করিতে পারে নাই। আজ বুড়ার মনে হইতে লাগিল এই সুন্দরী কিশোরীটির হাতে যদি সে চুড়ি পরাইয়া দিতে না পারে, তবে তাহার এই ব্যবসা মিথ্যা পণ্ডশ্রম হইয়া যাইবে; এই হাতখানিরই সন্ধানে সে সমস্ত জীবন রোদে রোদে গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বয়স কাটাইয়াছে, তাহার কাঁচা চুল পাকাইয়া ফেলিয়াছে। তাই যখন সেই কিশোরী তাহার কাছে চুড়ি পরিবে না বলিল তখন বুড়া বলিয়া বসিল—"তা যদি পরাতে না দাও ত মুই চুড়ি বেচব না!"

এই কথায় কিশোরীর ভারি লজ্জা বোধ হইল। সে আর কোনো কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে আগাইয়া আসিয়া বুড়ার কাছে বসিয়া তাহার সুন্দর সুকোমল হাতখানি বাড়াইয়া দিল—তাহার মুখে লজ্জার আভাস শাড়ীর লাল পাড়ের ছায়ার মতো ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

চুড়িওয়ালা মৃণালসংযুক্ত পদ্মের কলির মতো কিশোরীর

হাতের মুঠিটিকে নিজের দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া একবার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহের আবেগ দিয়া চাপিয়া চুড়ির মাপ ঠিক করিয়া লইল। বুড়ার মনে হইতেছিল যদি সে এই সুন্দর সুকোমল পদ্মের কলির মতো হাতখানি চোখের জলে ধুয়াইয়া চুমায় চুমায় একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, তারপর নিজের পসরাটি উজাড় করিয়া দিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যায়, তবেই তাহার উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগ কথঞ্চিৎ চরিতার্থতা লাভ করিয়া শান্ত হইতে পারে।

চুড়িওয়ালা কিশোরীর হাত দুখানিকে নিজের হাতে ধরিয়া টিপিয়া টিপিয়া লাল চুড়ি একগাছির পর একগাছি করিয়া পরাইয়া দিতে লাগিল। বেদনায় কিশোরীর মুখ একটু কুঞ্চিত হইলে সে বেদনা সহস্রগুণ হইয়া বুড়ার বুকে গিয়া বাজিতেছিল, আর বুড়া বলিতেছিল—"বড্ড কি লাগতিছে মা? একটু সহ্য কর মা, তা হলি এ চুড়ি তোমার হাতে চাপে বস্তা যাবে, সে যা মানাবে মা!"

কিশোরীর চোখ ছলছল করিতেছিল, তবুও সে বুড়ার কথা শুনিয়া মুখ লাল করিয়া তুলিয়া হাসিল—হাসিতে দুটি গালে দুটি টোল পড়িল।

চুড়ি পরাইয়া দিয়া চুড়িওয়ালা আপনার ঝুড়ি হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভালো ভালো পুতুল, কড়ি-বসানো বাক্স, খেলনা, ফুলদান বাহির করিল।

কিশোরী তাহা দেখিয়া বলিল—"ও-সব আমার কিছু চাইনে।"

বুড়া হাসিয়া বলিল—"তোমার না চাই, খোকারে দিয়ো।"

কিশোরী লজ্জায় আপাদমস্তক লাল হইয়া উঠিয়া মাথা নত করিল।

তাহার শাশুড়ী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বৌমার এখনো ত খোকা হয়নি, ও-সবের দরকার নেই।"

চুড়িওয়ালা তাহার ঝুড়ির উপর ঢাকা চাপা দিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল—"তা না হোক, আমার মা-ই ত এখনো খুকি আছে, মা-ই খেলিবে।"

কিশোরী বধূর শাশুড়ী বলিলেন—"ওগুলোর কত দাম?"

চুড়িওয়ালা ঝুড়ি মাথায় তুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ও-সব আমি মাকে অমনি দেলাম।"

শাশুড়ী বলিলেন—"ওমা, সেকি কখনো হয়! ওগো চুড়িওলা, তুমি যেয়ো না, দাঁড়াও গো, দাঁড়াও, দাম নিয়ে যাও।"

ততক্ষণে চুড়িওয়ালা পথে বাহির হইয়া পড়িয়া খুসি মনে হাসিমুখে হাঁকিতে হাঁকিতে যাইতেছে—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!"

সেই দিন হইতে চুড়িওয়ালা নিত্য দুপ্রহরে সেই গলির মধ্যে চুড়ি বেচিতে আসিতে লাগিল। চুড়ি ত আর নিত্যকারের প্রয়োজনীয় নয়, তাহাকে কেহ আর ডাকিত না। কিন্তু তাহার ডাক শুনিলেই সেই কিশোরী বধূটি একবার জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইত, আর বুড়া চুড়িওয়ালা দুই হাতে ঝুড়ি উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া লইত; দুজনে চোখোচোখি করিয়া সলজ্জ হাসির ভিতর দিয়া আপনাদের একটি দিনের ক্ষণিক পরিচয়ের গভীর প্রীতির সম্পর্কটি স্বীকার করিয়া যাইত।

কিশোরী বধূর শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেন—"কি বৌমা, তোমার খোকা এসেছে বুঝি? খাসা তোমার পাকা-দাড়িওলা খোকাটি বাছা!"

কিশোরী বধূ আনন্দের লজ্জিত হাসি হাসিয়া জানলা হইতে সরিয়া যাইত।

চুড়িওয়ালা ভাবিত সে যদি চুড়ি বেচা ছাড়িয়া দিয়া আলু পটল কি কেরোসিন তেল বেচিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে রোজ তাহার মায়ের বাড়ীতে যাওয়ার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু চুড়ি না বেচিলে ত সেই পদ্মকলির মতো মুঠিটি দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ ও স্নেহের ধারা মুক্ত করিয়া দিবার সুযোগ ঘটিবে না। সেই সুদূরের সুযোগের প্রত্যাশাতেই বুড়া চুড়ির পসরা মাথায় করিয়া দুপ্রহরের রৌদ্রে গলিতে গলিতে হাঁকিয়া ফিরিত—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!"

কিছুদিন পরে হঠাৎ সেই কিশোরী জানলায় তাহার নিয়মিত হাজরী বন্ধ করিয়া দিল। বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা হাঁকিয়া হাঁকিয়া ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া যায়, উপরের সেই গরাদে-

দেওয়া জানলার ফাঁকে সেই সুন্দর মুখখানি আর লজ্জিত স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঁকি মারে না। বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ফেরি সারিয়া ফিরিয়া যায়, কিন্তু ফিরিতে তাহার মন চাহে না, পা চলে না।

কিছুদিন ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁকের পর হাঁক দিয়াও যখন আর সেই জানলায় সেই মুখখানি কিছুতেই দেখা দিল না, তখন একদিন চুড়িওয়ালা সাহসে ভর করিয়া বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাঠাকরণ, চুড়ি লেবেন?"

বাড়ীর মধ্য হইতে রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—"না গো।"

চুড়িওয়ালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মাঠাকরুণ, আমার মা কনে গা?"

ঘরের মধ্য হইতে আবার রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—"এখানে নেই গো।"

সহস্র প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইলেও আর তাহার সাহসে কুলাইল না, সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া চলিয়া গেল—সে

ম্রিয়মাণ, গতি তাহার মন্থর, পথে পথে সে আর "চুড়ি চাই" বলিয়া হাঁকিলও না।

এখানে নাই। কিন্তু কবে আসিবে তাহারও ত স্থিরতা নাই। প্রতিদিন আশা বহিয়া চুড়িওয়ালা সেই গলিতে আসিয়া উচ্চস্বরে হাঁকে—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!" একবার, দুবার, তিনবার! তারপর সেই শূন্য জানলাটির দিকে ছলছল দৃষ্টি তুলিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার ফিরিয়া যায়। পরদিন আবার আসে।

এমনি করিয়া কত মাস গেল। পূজা আসিল। আজ ঘরে ঘরে চুড়ি কেনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে—সধবা, কুমারী, তরুণী, বালিকা, সবাই মনের মতন চুড়ি বাছিয়া বাছিয়া কিনিতেছে; চুড়িওয়ালা তাহাদের মুঠি হাতে লইয়া চুড়ির পর চুড়ি পরাইয়া দিতেছে! কিন্তু তাহার চিত্ত কিছুতেই প্রসন্ন হইতেছে না, প্রবোধ মানিতেছে না। তাহার মায়ের মতন সুন্দর হাত আর কাহারো না, তেমন নরম

মুঠি আর কাহারো না, তেমন মধুর হাসি আর মিষ্ট কথা কাহারো না।

অপেক্ষা করিয়া করিয়া বুড়া ক্লান্ত হইয়া আবার একদিন সে বাড়ীর সামনে গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বারবার করিয়া হাঁকিল—"বেলোয়ারী চুড়ি চাইয়ে, কাঁচের পুতুল খেলেনা চাইয়ে, গেলাস বাটি ফুলদান চাইয়ে!" কিন্তু কাহারো সাড়া পাইল না, কেহ তাহাকে জানলা হইতে ডাকিল না—"ও চুড়িওলা, চুড়িওলা, এই বাড়ীতে এস!" সেই জানলা তেমনি শূন্য, তেমনি নিরানন্দ! তখন আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চুড়িওয়ালা ডাকিল--"চুড়ি লেবেন মাঠাকরুণ?"

একজন ঝি বিরক্ত হইয়া তীব্র কণ্ঠে উত্তর করিল—"না গো না, একশ দিন বলেছি চুড়ি চাইনে, তবু কেন জ্বালাতে আস বল দিকিন? দরকার হয় রাস্তা থেকে ডেকে নেব।"

চুড়িওয়ালা ভয়ে লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সে চোরের মতো ফিরিয়া যাইবে, এমন সময় দেখিল সেই কিশোরী বধূর শাশুড়ী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া বৃদ্ধ চুড়ি-

ওয়ালা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"মাঠাকরুণ, আমার মা কি এহনো আসে নাই?"

শাশুড়ী ম্লানমুখে উদাস ভাবে চুড়িওয়ালার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এসেছে।"

চুড়িওয়ালা একমুখ হাসিয়া আনন্দ-গদ্‌গদ স্বরে বলিল—"মাঠাকরুণ, একবার তানাকে দেখতি পাই না? মারে আমার কতকাল দেহিনি—দেখতি আসি' আসি' ঘুরি যাই, দেখতি পাই না!" শাশুড়ী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি চোখ মুছিয়া স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"না বাবা, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না।"

বুড়ার আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখ একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া যেন নিবিয়া গেল। সে ব্যথিত ছলছল দৃষ্টিতে একবার বধূর শাশুড়ীর দিকে চাহিয়া হতাশ মনে গমনে অনিচ্ছুক পা দুখানিকে টানিয়া লইয়া ফিরিয়া চলিল। সে এই পূজার সময় বাজার ঢুঁড়িয়া সব চেয়ে ভালো এক জোড়া চুড়ি পছন্দ করিয়া আনিয়াছিল তাহার সুন্দরী মা-টির হাত

নিজের হাতে ধরিয়া পরাইয়া দিবে বলিয়া। কিন্তু যেখানে ভালো বাসিবার অধিকার আছে, পাইবার দাবী করিবার অধিকার নাই, সেখানে সে কেমন করিয়া জোর করিবে? সেই কিশোরী বধূটি যদি তাহার কন্যা হইত, তবে কি তাহার শাশুড়ী তাহাকে এমন করিয়া বিমুখ করিয়া হতাশ করিয়া ফিরাইতে পারিত? বুড়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পতনোন্মুখ অশ্রু গামছায় মুছিয়া ফেলিল। সদর দরজা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গিয়া চুড়িওয়ালা থমকিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবার ঘাড় ঘুরাইয়া পিছু ফিরিয়া দেখিল। তার পর আবার ফিরিয়া মন্থর কুন্ঠিত পদে বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

চুড়িওয়ালা দেখিল বধূর শাশুড়ী তখনো রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। চুড়িওয়ালা গলায় গামছা দিয়া দুই হাত জোড় করিয়া মিনতি-বিগলিত স্বরে বলিল—"মাঠাকরুণ, মুই চুড়ি বেচতি আসি নাই। একডা বার মায়েরে মোর দেহি যাতাম!"

এই বলিতেই বুড়ার চোখ দিয়া টপ-টপ করিয়া বেদনা-ভরা মিনতি অশ্রুজলে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বধূকে একজন নিঃসম্পর্ক পথের লোকের সামনে বাহির করিবার পক্ষে যেটুকু আপত্তি ছিল, বৃদ্ধ চুড়িওয়ালা তাহা চোখের জলে নিঃশেষে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিল। চোখের জল এই বৃদ্ধ মুসলমান চুড়িওয়ালার সহিত কিশোরী বধূর একটী প্রাণের টানের নিকট-সম্পর্ক এক নিমেষে প্রমাণ করিয়া দিয়া গেল। বধূর শাশুড়ী এক মুহূর্ত্ত তাহার দিকে তাকাইয়া অক্ষিপল্লব হইতে কম্পমান অশ্রুবিন্দু মুছিয়া অশ্রুপূর্ণ স্বরে ঝিকে বলিলেন—"মোক্ষদা, বৌমাকে একবার ডেকে দে!"

কিশোরী বধূ ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত জড়িত পা ফেলিয়া চুড়িওয়ালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। চুড়িওয়ালা একমুখ হাসিয়া কোঁচার খুঁট হইতে কাগজের বাক্স খুলিয়া এক জোড়া বিচিত্র বর্ণের জড়োয়া কাঁচের চুড়ি বাহির করিয়া বলিল—"মা, হ্যা হ্যাহ, তোমার জন্যি মুই জুবিলি চুড়ি আন্যাছি!"

চুড়িওয়ালা হাসিমুখ তুলিয়া চুড়ি জোড়া কিশোরী বধূর হাতে দিতে গিয়া দেখিল, কিশোরীর হাতে কোনো গহনা নাই! তাহার লাল হাত হইতে তাহার অত সখের

লাল চুড়ি সে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে; সিঁথি হইতে সিঁদুর মুছিয়া ফেলিয়াছে; মাথার উপর কস্তা-পেড়ে শাড়ীর চৌড়া লাল পাড় আর হাসিতেছে না; পায়ে লাল আলতা নাই; ঠোঁটে লাল পান নাই; নাকে নোলক নাই; কানে সে সুন্দর দুল নাই; মুখে সে ভুবন-ভুলানো হাসিটুকুও নাই! একখানি শুভ্র থান তাহার যুথির মতো শুভ্র সুন্দর ম্লান মূর্ত্তিখানি কুন্ঠিতভাবে জড়াইয়া যেন মূর্চ্ছিত হইয়া আছে। এই মূর্ত্তিমতী শোকের মূর্ত্তি দেখিয়া চুড়িওয়ালা চুড়ি-জোড়া আছড়াইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সেই চূর্ণিত চুড়ির মতোই ভাঙা বুকের মধ্য হইতে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাতে চোখ চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"মা রে, এ মুই কী ত্থাখলাম! অ্যার আগে মুই মলাম না ক্যান!"

কিশোরী মাথা নত করিয়া ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া চলিয়া গেল, তাহার শাশুড়ী চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরে চলিয়া গেলেন। আর বুক-ভাঙা বুড়া চুড়িওয়ালা দুর্ব্বল কম্পিত হস্তে পসরা মাথায় তুলিয়া আস্তে আস্তে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

পিঞ্জরের বাহিরে

১

ভাই ললিতা,

অনেক দিন তোমার কোনো খবর পাই নি; আমিও তোমায় চিঠি লিখিতে পারিনি। আমার জীবনের ওপর দিয়ে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে; আমি অনেক রকম নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। সেই-সমস্ত খবর তোমায় ছাড়া আর কাকেই বা বলি? তাই তোমায় সব কথা খুলে বলবার জন্যে মনটা আমার ব্যাকুল হয়েছে।

আমার বাবার মৃত্যু হয়েছে। এখন আমার মা, আর ছোট ভাই-বোন দুটির অভিভাবক আমিই। এখন বুঝতে পারছি মেয়েমানুষ বাস্তবিকই অবলা। কবিরা তাদের লতার সঙ্গে তুলনা করে—সদাই দুর্ব্বল, পর-নির্ভর; একটু তাত লাগলেই আম্‌লে নেতিয়ে পড়ে, একটু আঁচ লাগলেই মুষড়ে যায়; একটু ধাক্কা খেলেই ধূলায় লুণ্ঠিত হবার আশঙ্কা। আমি তাদের নদীর স্রোতের সঙ্গে তুলনা করি—

তটের বন্ধনের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই তার গতি শোভন সুন্দর; ততক্ষণই প্রাণের ও প্রাচুর্য্যের. আনন্দের ও সৌন্দর্য্যের হাস্যধারা; ততক্ষণই তার সম্মুখে অনন্তের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা; কিন্তু যেই সে কুল ছাড়িয়ে উপচে ছড়িয়ে পড়ে, অমনি সে নিজেকে ত হারায়ই, পরকেও ডোরায়,—চারিদিককার আনন্দ, সৌন্দর্য্য, প্রাণের খেলা নষ্ট ভ্রষ্ট করে ফেলে। এমনই অক্ষমতা নিয়ে আমরা জন্মেছি, বিশেষ ত এই বাংলা দেশে। আমার মতন এমন একজন অক্ষমার ঘাড়ে একটি অসহায় সংসারের ভার ভগবান চাপিয়ে দিয়েছেন। আমাকে সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, পরের উপর নির্ভরের আশা ছেড়ে পরের ভর সইতে হবে!

অন্নের সন্ধানে আমাকে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে হয়েছে। কিন্তু কোথায় অন্ন, কেমন করে সংগ্রহ করতে হয়, আমি কি ছাই জানি? আমরা অন্নপূর্ণা ততক্ষণই যতক্ষণ পুরুষেরা অন্নে ভাণ্ডার পূর্ণ করে রাখে। আমরা চিরকাল পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থাকি, যারা আমাদের পোষে তারা তাদের খেয়াল-মত যখন খুসি একটু ছাতু ছোলা

দুধ জল দিয়ে যায়, আর আমরা দিব্য নিশ্চিন্ত হয়ে মধ্যে মধ্যে শিশ দিয়ে গান করি আর গানের সমের ঘরে চুমকুড়ি দি। পিঞ্জরের ভিতর বন্ধ থেকে প্রাণটা যে হাঁপিয়ে না ওঠে এমন নয়; শিকের ফাঁকে ফাঁকে মুক্ত আকাশের নীল চোখের ইসারা আর তরুপল্লবের হাতছানি দেখে মনটা খুবই উড়ু উড়ু করে। কিন্তু কোনো দিন খাঁচার দরজা খোলা পেলেও উড়তে সাহস হয় না, বুক দুরদুর করে, পাখা যেন অবশ হয়ে আসে। যিনি আমাদের খাঁচার মালিক, তিনি যদি কোনো দিন দয়া করে' খাঁচার দরজা খুলে ধরে' উড়ে যেতে বলেন তখন মালিকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ হয়। ভয় হয় অত বড় ফাঁকা জায়গায় আমি এতটুকু ভীরু প্রাণী কোথায় পাব একটু আশ্রয়, আর কোথায় পাব ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল। অপরিচয়ে সোজা পথটাকেও বাঁকা লাগে, নিরীহ জিনিষটাকে দেখেও ভয় লাগে, স্বাভাবিক ঘটনাকে বিপদের সূচনা বলে আশঙ্কা হয়। তাই যদি কোনো দিন আমাদের মালিকের অভাব হয়, অমনি আমরা পিঁজরের ভিতর বসে বসে ঠায় শুকিয়ে মরি, বাইরে বেরিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করতেও পারিনে।

আমি ভাই, অসাধ্যসাধন করে ফেলেছি, বাইরে বেরিয়ে পড়েছি।

বাইরে বেরিয়েই আমার সব চেয়ে বেশী ভয় লেগেছিল ঐ পুরুষগুলোকে দেখে। নিঃসম্পর্ক পুরুষের সঙ্গে ত আমাদের মোটেই পরিচয় নেই। বাপ-খুড়োদের কোলেই আমরা জন্মাই, আর ভাই-ভাইপোদের আমরা কোলেই পাই; তাদের সঙ্গে পরিচয় আমাদের পাতাতে হয় না। পরিচয় পাতাতে হয় যে-একটি অচেনা লোকের সঙ্গে, তাকে দেখে প্রথম-প্রথম ভয় লাগলেও সে একলা বলে' সাহস থাকে। কিন্তু একেবারে পুরুষের হাটের মধ্যে ছেড়ে দিলে আমাদের দশাটা হয় সিংহের খাঁচার মধ্যে রোমান্ গ্লাডিয়েটরের মতন—যত বড়ই বীর আর সাহসী হোক, মৃত্যু তার অনিবার্য্য, পরাভব তার জানা কথা। আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে যে সেকালের রাজকন্যারা কেমন করে' স্বয়ম্বর-সভায় নিজেদের বর বাছাই করতে যেত! ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যেত না? দাড়ি আর চোগোঁপ্পা চুমরে চারিদিকে আমিষ-লোলুপ মার্জ্জারের মতন অতগুলো পুরুষ প্যাটপ্যাট করে চেয়ে রয়েছে, তার মধ্যে

দাঁড়িয়ে বাছাই কর্‌ব কাকে? ভয়ে লজ্জায় সেদিকে তাকাতেই ত পারা যাবে না! অথচ তারা প্রত্যেকে লোলুপ হয়ে আমার দিকে তাকিয়েই আছে! আমার ত মনে করতেই গা শিউরে ওঠে! সত্যি ভাই, পুরুষগুলো কি বিচ্ছিরি করেই যে তাকায়!

আমি শেয়ালদা ষ্টেসনে টিকিট বিক্রী করবার একটা চাকরী পেয়েছি। সামান্য মাইনে। রোজ ত আর গাড়ী করে আপিসে যেতে পারিনে, কাজেই ট্রামে করে' আপিসে যেতে হয়। যেদিন ভাই প্রথম ট্রামে করে' আপিসে যাব বলে' বেরুলুম, সেদিন মনের অবস্থা যে কি হয়েছিল তা অন্তর্য্যামীই জানেন। ফাঁশীকাঠে চড়বার সময় মানুষের মন বোধ হয় এমনি করে।—পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল, ঠোঁট শুকিয়ে উঠছিল, মুখ অকারণ লজ্জায় কেমন ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে পড়ছিল, বুক দুরদুর করছিল। আমি জোর করে' ত নিজেকে এক রকম টেনে নিয়ে গিয়ে ট্রাম থামবার থামের কাছে ফুটপাথের ধারে রাস্তার দিকে মুখ করে' দাঁড়ালুম।

পথিক পুরুষদের মধ্যে অমনি একটা চঞ্চলতার ঢেউ

জেগে উঠল। ভাগ্যিস্ ভগবান মাথার পেছন দিকে চোখ দেননি। সামনে পেছনে পুরুষদের বাঁদরামি লক্ষ্য করতে হলে একেবারে ক্ষেপে উঠতে হ'ত। একদিকে যে অনেকখানি অদেখা থেকে যায় সেটা মস্ত বাঁচোয়া!

ট্রামে উঠেও কি ছাই নিস্তার আছে? আমি ট্রামের পাদানে উঠবামাত্রই• ট্রামযাত্রী পুরুষগুলো অমনি উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে, আমি কোন্ কামরায় না-জানি ঢুকি।

পুরুষগুলো ভাই এমনই হাস্যকর জীব যে তাদের দেখে আমাদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে ওঠে; তার ওপর আবার ওরা নানান্ রকম ভঙ্গী করে লোক হাসায় যে কেন তা বলতে পারিনে।

প্রথম নজরেই তাদের বিকট মূর্ত্তির বিচিত্র রূপ ভারি কৌতুককর মনে হয়। কারো মুখে গোঁপদাড়ির নিবিড় জঙ্গল, তার ভেতর চোখ দুটো বনবিড়ালের মতো ওত পেতে বসে থাকে। কারো দাড়ি কামানো, শুধু গোঁপ জোড়া একজোড়া ঝাঁটার মতো মুখের দরজার মোটা কপাট জোড়ার ওপর ঝোলানো রয়েছে, যেন কুনজর না লাগে। কেউ বা দাড়িগোঁপ সমস্ত চেঁছেছুলে নির্ম্মূল করে'

আমাদের মুখের অনুকরণ করতে চায়—কিন্তু ও চাষাড়ে চেহারা শুধু দাড়িগোঁপ কামালেই বা মোলায়েম হবে কেন? কাউকে কাউকে মন্দ দেখায় না বটে, কিন্তু অধিকাংশকেই নাকুন্দ মতন বিশ্রী লাগে। কারুর বা দাড়িগোঁপ দুই ছাঁটিয়া মাফিকসই করিয়া রাখা—তাদের তত মন্দ লাগে না। পুরুষ বেচারারা দাড়িগোঁপগুলো নিয়ে যেন মহা গণ্ডগোলে পড়ে গেছে, ঠিক করেই উঠতে পারছে না জঙ্গলমহাল রাখবে, ছাঁটবে, না কাটবে!

তারপরে মাথার টেড়িরই বা কত রকম রূপ! তোলা, লতানো, ঢেউখেলানো, কোঁকড়ানো; সিঁথি মাঝে, ডাহিন দিকে, বাঁ দিকে; কারুর সারা মাথায় টাক, সামনের দুটি-খানি পাতলা চুলেই টাক ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টায় টেড়ির ক্ষীণ আভাস দেখা যায়; কাহারো মাথায় সামনে টেড়ি, পশ্চাতে টিকি! এই দৃশ্যটি দেখে আমার এমন হাসি পেয়েছিল যে অসভ্যগুলোর মধ্যে আমিও আর একটু হলে অসভ্য হয়ে পড়তুম।

পোষাকেরই বা কত রকম বিচিত্রতা। ওরা এখনো ঠিক করতেই পারেনি কেমন সজ্জা ওদের ঠিক মানায়।

কারো পূরো দস্তুর সাহেবী সজ্জা—কিন্তু পাজামাটা হয়ত সরুঙ্গে, কোটটা ঢলঢলে, টাইটা বাঁকা, কলারটা শার্ট ছেড়ে ঠেলে উঠে পড়েছে, হ্যাটটা কতককেলে পুরোণো ময়লা—তবু সাহেব সাজতে হবে! কারো ধুতির ওপর চাপকান, তার ওপর চাদর, মাথায় কিছু নেই; কারো গায়ে কোট, কারো শার্ট, কারো পিরান। কারো জামা ঘামে তেলে একেবারে জরে উঠেছে, দুর্গন্ধে পাশের লোককে অতিষ্ঠ করে তুলছে, ছেড়ে ধুতে দেবার তাড়া নেই; কারো জামায় কাপড়ে পানের পিক ছিটিয়ে পড়েছে, কানে গোঁজা দাঁত-খোটা খড়কের মুখে চিবানো পানের কুচি আর ছোপ লেগে আছে। ওরই মধ্যে দুএকজনকে বেশ ভদ্রলোকের মতন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও দুটি শ্রেণী আছে—এক একেবারে ফুলবাবু, আতিশয্যে উগ্র; অপর শ্রেণী সাদাসিধে, বেশ শান্তদর্শন।

ট্রামে যখন উঠি তখন একটু সরে বসে আমায় একটু জায়গা দেওয়া যে দরকার, এ বোধটাও পুরুষ বর্ব্বরদের থাকে না, সবাই হাঁ করে' দৃষ্টি দিয়ে যেন আমায় গিলতে থাকে; আমি যেন সদ্য চন্দ্রলোক থেকে নেমে এসেছি।

ওদের চোদ্দ পুরুষে কখন যেন মেয়ের মুখ দেখেনি। পুরুষ গুলোর তখনকার সেই গদগদ আত্মবিস্মৃত চঞ্চল ভাব দেখলে আমার সেকালের স্বয়ম্বর-সভার একটি পরিষ্কার ছবি মনের সামনে ফুটে উঠে। কালিদাস ইন্দু-মতীর স্বয়ম্বর-সভার বর্ণনায় একটুও যে অত্যুক্তি করেন নি, তা আমি এখন বেশ ভালো করেই বুঝতে পারছি।

লোকগুলোকে ঠেলেঠুলে জায়গা করে যদি বসা গেল তবেই যে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল তা নয়; পরে যারা ট্রামে চড়তে আসে তাদের মধ্যেও নানা রকম মনস্তত্ত্বের খেলা দেখিতে পাওয়া যায়। কেউবা যে কামরায় আমি থাকি ঠিক সেই ভরা কামরাতেই ভিড় বাড়াতে আসে, অন্য কামরা খালি থাকলেও সেদিকে যেতে চায় না; কেউবা সামনের কামরায় উঠে এমন জায়গা বেছে নেয় যেন ঠিক আমার সামনাসামনি মুখোমুখী হয়ে বসতে পারে; কেউবা ঠিক পিছনের কামরায় উঠে ঠিক আমার পিঠের কাছে বসে' নানান ভঙ্গিতে হেলান দেবার দুশ্চেষ্টা করিতে থাকে; কেউবা গাড়ীতে উঠেই এমন একটা অতিসম্ভ্রমের তটস্থ ভাব দেখিয়ে ছিটকে তফাতে গিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে,

যেন স্ত্রীজাতিটার প্রতি তাঁরা এমন অতিসম্ভ্রমশীল যে প্রায় উদাসীন বল্‌লেও হয়—যেন এক-একটি শ্রীচৈতন্যের অবতার! তাদের সেই অশোভন ব্যবহার দেখে আমার হাস্যসংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অতি ব্যাপারটাই যে খারাপ! যারা অসম্ভ্রম প্রকাশ করে তারা যেমন পুরুষচরিত্রের বর্ব্বরতার একটা দিক, অতিসম্ভ্রমশীলেরাও তেমনি ভণ্ডামির আর-একটা দিক প্রকাশ করে মাত্র! কদাচিৎ দু-একজনকে দেখতে পাওয়া যায় যারা নারীকে দেখতে যে তাদের ভালো লাগে, নারীর সঙ্গ যে তাদের মধুময় লাগে, তা লুকোতেও চেষ্টা করে না, অথচ কদর্য্য অশোভন ভাবে প্রকাশও করে না,—তারা নারীকে ভালোও বাসে, সম্ভ্রমও করে। এমন একটি পুরুষের কথা পরে বলব, সে লোকটিকে আমার লেগেছে ভালো। ভালো লেগেছে শুনে তুমি হাস্‌ছ বোধ হয়? কিন্তু ভালো লাগা ভালো-বাসা নয়, এটা আমি আগে থাকৃতেই তোমায় বলে রাখছি।

ট্রামে চড়বার সময় যেমন, নামবার বেলাও তেমনি আমাদের দেখে পুরুষদের অশেষ রকম লীলা-চতুরতা

প্রকাশ পায়। কেউবা আমার কাছ দিয়ে যাবার সময় আমার পায়ের উপর দিয়ে কোঁচার ফুলটি বুলিয়ে চরণ-ধূলির নিছনি নিয়ে যায়।

আমি যখন নামি তখনও ওদের নানারকম লীলা লক্ষ্য করি। আমি নেমে গেলে সকল জানলা থেকেই মুখ ঝুঁকে পড়ে, দেখতে চায় আমি কোন্ পথে কোথায় যাই—আমার চারিদিকে যেন একটা মস্ত রহস্য জড়িয়ে আছে, সকলেরই চেষ্টা উঁকি মেরে সেই লুকানো কাহিনীটা জেনে নেবে।

পুরুষগুলো যে অমন তার জন্যে প্রকৃতিই দায়ী। প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তিগুলোকে প্রকৃতিস্থ করতে পারেনি বলে' বেচারাদের ওপর করুণা হয়, রাগ করা চলে না। বিশেষত আমাদের দেশের পুরুষদের ওপর। বেচারীরা অপরের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের মুখ ত কখনো দেখতে পায়ই না, নিজের স্ত্রীরও যে খুব বেশী পায় তাও ত মনে হয় না। দুষ্প্রাপ্য জিনিসের প্রতি লোলুপতা ত স্বাভাবিক।

পুরুষ যে নারীর প্রতি অতিমাত্রায় অনুরাগী ও মনোযোগী এতে নারীরা মুখে পুরুষের ওপর যতই চটুন, মনে মনে কিন্তু বেশ সন্তুষ্টই হন; কারণ তাঁরা যে বন্দিতা,

আরাধিতা, এ কথা জান্‌লে খুসি হওয়া স্বাভাবিক। আমি যে খুসি হই তা আমি স্পষ্টই স্বীকার করছি! পুরুষেরা যে আমাদের অতটা শ্রদ্ধা সম্ভ্রম দেখায় তার আর-একটা কারণ আমার মনে হয় যে, তারা প্রবল আমরা দুর্ব্বল, তারা আশ্রয় আমরা আশ্রিতা; সংসারের সঙ্গে পদে পদে বোঝাপড়া করে' আপোষ-মীমাংসা করে' চলতে হয় বলে' তাদের একটা সহগুণ আর ভদ্রতা চরিত্রগত হয়ে গেছে বলেও কতকটা। একটা আমরা বিশেষ ভাবে অনুভব করি যখন আর-একজন অপরিচিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে আমাকে গ্রাহ্যও করে না। কিন্তু সে যদি পুরুষ হ'ত তা হলে আমাকে দেখতে পেয়েই সে কৃতার্থ হয়ে যেত। পুরুষের এই ভদ্রতা যে শুধু আমাদেরই বেলায়, তা নয়; সে স্বজাতির প্রতিও যথেষ্ট খাতির দেখিয়ে চলে। যেখানে অনেক অপরিচিত মেয়ে একত্র হয়, সেখানে একটু গায়ে গা ঠেকলে কি কাপড় মাড়িয়ে ফেললে আর রক্ষা থাকে না; যার ত্রুটি সেও ক্ষমা চাইতে জানে না, যার অসুবিধা ঘটেছে সেও ক্ষমা করতে পারে না; অতি তুচ্ছ কারণে কোন্দল বাধিয়ে

কলরব করতে লেগে যায়। কিন্তু ট্রামে আকসারই দেখি, একজন পুরুষ হয়ত অপরের পা মাড়িয়ে ফেললে, কিংবা অপরের গায়ে টলে পড়ল, তাতে সে ব্যক্তি শুধু একটি নীরব নমস্কার করলেই সকল গোল মিটে যায়। এক বাড়ীতে দুজন রক্তসম্পর্কে পরমাত্মীয় স্ত্রীলোক থাকলে ঝগড়ার চোটে চালে কাগ চিল বসতে পারে না; কিন্তু এক-মেস নিঃসম্পর্ক পুরুষ দিব্য বনিবনাও করে' মানিয়ে সাম্‌লে থাকে দেখা যায়। এত যে তারা ভালো মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে ভাব করে থাকে, মাঝখানে একটি মেয়ে-লোক এসে পড়লে আর তখন তার থাকে [illegible]—ভাই ভাইয়ের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে পারে না। বাস্তবিক মন আর মন জোগানে স্ত্রীলোক যত পটু পুরুষ তেমন নয়। সে বিষয়ে রমণীর কুশলতা একেবারে জগৎ জোড়া! মেয়েরা [illegible] দিকে সুনজরে ত দেখেই না, পুরুষকে যে খুব খাতির করে' চলে তাও নয়। যতটুকু দয়া সে যেন অনুগ্রহ [illegible]কে একটু তাচ্ছীল্যের দান! এতে আমাদের কিন্তু লাভ আছে—পুরুষগুলো আমাদের কাছে

চিরকালই ভিখারীর মতন অবনত হয়েই পড়ে থাকে—কিন্তু গৌরব নেই।

তারা অতৃপ্ত বলেই আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা তাদের জীবনের সম্বল ; আমাদের একটু দেখতে পাওয়া, একটু মিষ্টি কথা শোনা; তাদের পরম লাভ বলে মনে হয়। দুজন আলাপী পুরুষ এক সঙ্গে মিলেছে কি অমনি আমাদেরই কথা। মানুষ মাত্রেরই জীবনের কতকটা অংশ যে গোপন রাখা দরকার, এই সামান্য বুদ্ধিটুকুও ঐ গোঁয়ারগোবিন্দগুলোর ঘটে নেই। রবিবাবু যে তাঁর স্বজাতির জবানীতে স্বীকার করেছেন যে—

"আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!"

সেটা কবির অত্যুক্তি একটুও নয়, একেবারে খাঁটি স্বরূপোক্তি। ওদের ব্যবহার দেখে লজ্জা যেন লজ্জা পেয়ে বিদায় নিয়েছে ; কিন্তু আমি লজ্জায় মারা যাই। ওরা যদি কোথাও বেশ সহজ হতে পেরেছে! ওরা রেল-ষ্টেসনে টিকিট নেবার ঘুলঘুলি দিয়ে এমন হাঁ করে' তাকিয়ে থাকে যে, ট্রেন ছেড়ে যাবে, কি কেউ পকেট কাটবে, তার

খেয়ালই থাকে না। অনেক বাবুকে দেখি আমার হাত থেকে টিকিট কিনে নোট-ভাঙানি টাকা পয়সা ফেরত নিতে ভুলে যান। মূর্খগুলো জানে না যে ওতে ওদের আমরা ঘৃণাই করি।

পুরুষদের আর একটি ভারি মজা দেখি যে তারা আমাদের কোনো একটু তুচ্ছ কাজ করে' দিতে পেলে যেন বর্ত্তে যায়। আমার সঙ্গে যদি কোনো দিন কিছু জিনিষ-পত্তর থাকে, তা হলে আমি নামবার সময় অন্তত চতুর্ভুজ উদ্যত হয়ে ওঠে; তার মধ্যে যে ভাগ্যবান্ আমার সেবা করবার অধিকার পায় তার তখনকার কৃতার্থ মুখের ভাব, আর অন্য সকলের তার দিকে সপ্রশংস অথচ ঈর্ষা-আকুল চাওয়া বাস্তবিক দেখবার জিনিষ।

এমনি করে' একটি লোক তার সহযাত্রীদের ভারি ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছে।

এই ঈর্ষাটা পুরুষচরিত্রের ভারি একটা চিরন্তন দিক। পশু-জগৎ থেকে আরম্ভ করে' মনুষ্য-জগৎ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় যে রমণীর করুণা যে পায় তার সঙ্গে, ব্যর্থ যারা তারা সকলে এককাট্টা হয়ে লাগে। কিন্তু গোঁয়ার

গোবিন্দগুলো বোঝে না যে একজন ছাড়া আর সকলের নিরাশ ত হতেই হবে; যে ভালোবাসা পেয়েছে সে না পেয়ে আর-একজন পেলেও সেই একজনেরই লাভ। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে অজ বেচারাকে ইন্দুমতীর ভালো লেগেছিল বলে' সমস্ত রাজাগুলো একেবারে ক্ষেপে মারমুখো হয়ে উঠল! কেন রে বাপু? বেচারার অপরাধ? সে যদি শ্রীকৃষ্ণের মতন রুক্মিণী-হরণ বা অর্জ্জুনের মতন সুভদ্রা-হরণ করত তাহলে না হয় ওরা বলতে পারত যে অজ অন্যায় করেছে, ইন্দুমতীকে পছন্দ করবার সুযোগ দিলে না, হয়ত তার শ্রীহস্তের বরমাল্য তাদের কারো গলায় পড়তে পারত। কিন্তু ইন্দুমতী ত তাদের সে ক্ষোভটুকু করবারও অবসর রাখেনি।

আহাম্মকেরা এটুকুও বুঝতে পারে না যে যাকে তারা প্রার্থিত রমণীর সম্ভাব্য ভালোবাসা থেকে দূরে রাখতে যায়, তাকে নির্য্যাতিত দেখে সেই রমণীর অসম্ভব ভালোবাসাও করুণায় যে সম্ভব হয়ে আসে। তাকে দূর :করতে গিয়েই তাকে আরো নিকট করে' তোলে!

এমনি করেই ওরা ভাই, দশচক্রে আমায় একজনের

অনুরক্ত করে তুলেছ। এই অনুরাগটা বিপন্ন আশ্রিতের প্রতি করুণা ছাড়া আর কিছু নয়; ভালোবাসা মনে কর্‌লে ভুল কর্‌বে।

এ আমার ট্রামের সহযাত্রী। প্রায় রোজই ট্রামে দেখা হয়। হঠাৎ একদিন দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার কারণ ঘটে গিয়েছিল। একদিন আমার আপিস যেতে বড় বেলা হয়েছিল। যখন ট্রাম ধরতে গেলাম তখন আপিসে যাবার ঠিক মুখোমুখী সময়। ট্রামগুলো একেবারে লোকে লোকারণ্য। লোকগুলো পাদানের ওপর দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলিতে চলেছে। অমন গাছে ঝোলা অভ্যাস ত আমাদের নেই; পুরুষগুলো পূর্ব্ব পুরুষের যে নিকট জ[illegible]তি গোঁপ-দাড়ি [illegible] জা[illegible]ল্যমান প্রমাণ [illegible] গয়ে এসেছি [illegible], আমরা [illegible] গেছো [illegible]নরং পারি [illegible] না, পারলেও লজ্জা নামক মনুষ্যধর্ম্মটা আমাদের পুরো মাত্রাতেই আছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একখানা ট্রামে কেউ ঝুলছে না দেখে একটা কামরায় উঠে পড়লাম। একটিও যায়গা খালি নেই। মনে করলাম, পুরুষগুলো রমণীর সেবা করবার কাঙাল, এখনি কেউ-না-কেউ উঠে

আমায় জায়গা করে' দেবে। কিন্তু একটাও একটু নড়ল না !

কেউ উঠল না দেখে যখন আমি ভয়ানক অপ্রস্তুত হয়ে কি করব ঠিক করতে পারছিনে, তখন দু কামরা দূর থেকে একটি তরুণ যুবক দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে—আপনি এইখানে আসুন, আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি।

তার কথায় আমার যে কি আরাম হল তা আর বলতে পারিনে। আমি যেন এক-খাঁচা বুনো ভালুকের কবল থেকে অব্যাহতি পেয়ে বেঁচে গেলাম !

ট্রামের ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম থামিয়ে সে আমাকে নিজের জায়গাটিতে নিয়ে গিয়ে বসালে এবং নিজে গাড়ীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তার মুখ তখন একগাড়ী লোকের ওপর জয়ের আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছে ! আর বাকি লোক-গুলোও তার দিকে এমন করে' তাকাতে লাগল যেন বলতে চাচ্ছে—এঃ ! বড্ড জিতে গেল !—এ জিত ত তারাও জিততে পারত। কিন্তু যারা থাকে সুযোগের টিকি ধরবার জন্যে, তাদের সুযোগ ফস্কেই যায় ; যে বুদ্ধিমান, সে সুযোগের সামনের ঝুঁটি ধরেই সুযোগকে কাবু করে' ফেলে !

এ দেশটা কেবলই পেছু ফিরে তাকিয়ে তাকিয়ে টিকির মমতা করেই গেল!

এখন আমি ট্রামে উঠবার সময় একবার সব কামরায় উঁকি মেরে দেখি সে আছে কি না। যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে সে যে কামরায় থাকে সেই কামরায় গিয়ে উঠি, আর কেউ যায়গা না দিলেও সে আমায় জায়গা ছেড়ে দেবে, মাত্র এই আশায়। আমি যে রোজ তারই কামরা বেছে উঠি, এটা সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে; আমি উঠবামাত্রই সে একমুখ হাসি নিয়ে ধী ও শ্রীর জ্যোতিতে ভরা চোখ দুটি আরতির যুগল প্রদীপের মত আমার দিকে একবার তুলে ধরে, পরক্ষণেই নিজের হাতের বইখানির উপর নামিয়ে রাখে। এইখানে আসল পুরুষের পরিচয় পেয়ে আমিও আমার দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা সাজিয়ে ধরি!

ওদের একটি দল আছে ভারি মজার। ওরা জগৎ সংসারের কাউকে রেয়াৎ করে' ছেড়ে কথা কয় না—সকলেরই নিরিখ কষতে ব্যস্ত। এরা বোধ হয় সাহিত্যিক, কারণ সাহিত্যের আলোচনাই বেশী শুনি। এদের একজন নাকি কবি। তাঁর দুনিয়ার দুচার জন লোক ছাড়া আর

কারো লেখা বড় একটা ভাল লাগে না—সে এমনি খুঁৎ-খুঁতে আর একগুঁয়ে যে, যা গোঁ ধরে তা ওর বন্ধুরা শত যুক্তি তর্কেও টলাতে পারে না। এরা দেখি সবাই স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু কবিটির মত ভারি অদ্ভুত ধরণের; উনি বলেন বাইরে বেরুবে শুধু সুন্দরী তন্বীরা; মোটা, কালো, কুৎসিত যারা তাদের অবরোধে বন্ধ থাকাই উচিত। একথা শুনে আমার মিল্টনের কোমাসের যুক্তি মনে পড়ল, —Beauty is nature's brag, প্রকৃতির গর্ব্বের ধন সৌন্দর্য্য, যাদের তা আছে তারা লুকিয়ে থাকবে না; ঘোমটায় মুখ ঢাকবে যারা কুৎসিত। কিন্তু যিনি একথা বলেন, তিনি যে খুব সুপুরুষ তা ত মনে হয় না। মানলাম না হয় উনি কবি, সৌন্দর্য্যের উপাসক। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি শুধু চোখেই ধরবার জিনিস? রমণী কি শুধু ফুলের মতোই রমণীয় না হলে সুন্দর বলে স্বীকৃত হবে না? ইংরেজীতে একটা কথা আছে—স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য। রূপসী না হলেও ত সুন্দরী হতে বাধে না। যাদের রং বা চেহারা দৈবগতিকে নয়নরঞ্জন হয়নি তাদের কি পৃথিবীটা দেখে জানবার শিখবার আনন্দ পাবার দরকার নেই? জগতের

সংস্পর্শে সংঘর্ষে না এলে তারা মানুষ হবে কেমন করে'—দেহ ও মনের স্বাস্থ্য বল সঞ্চয় করবে কোথা থেকে? আমার মনের প্রশ্নটাই যেন কেড়ে নিয়ে তার এক বন্ধু বল্লে—"তবে তোমার আমারও বাইরে বেরুনো উচিত নয়; তুমি যেমন মেয়েদের বলছ, মেয়েরাও ত তেমনি বলতে পারে—হোঁদলকুৎকুতে রকমের পুরুষদের মুখদর্শন আমরা করব না।" কবির যুক্তি—"তা কেন? আমরা চিরকাল বাইরে আছি, বাইরেই থাকব, বিশেষত আমাদের যখন জীবিকা অর্জ্জন করতে হয়।" আহা কি আহ্লাদে যুক্তি! যদি রোজগারের কথাই বলেন, তা হলে আমাদের দেশের কত মধ্যবিত্ত গরীব ঘরের মেয়ে উপবাসে থাকে, তাদের কি বাঁচবার জন্যে বাইরে বেরুতে হবে না? তারা বাইরে বেরুতে পারে না, সকল মেয়েই বাইরে বেরোয় না বলে, বর্ব্বর পুরুষগুলোর চোখে নারী জাতির স্বাধীনতা সয়ে যায়নি বলে'! পুরুষদের ভালো লাগে না বলে তারা খাঁচায় বন্ধ থেকে অনাহারে মরে, তবু বেরোয় না। তারপর অসহ্য হলে তারা যখন বেরোয় একেবারেই বেরোয়! পথে বাড়ীর মেয়েরা বেড়ালে আমাদের দেশের পুরুষপুঙ্গবদের

মাথা হেঁট হয়! কিন্তু তাঁরা যখন অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে' অবলাকে পথে বসান, তখন মাথাটা খুব উচু করেই চলতে পারেন বোধ হয়! বেহায়াদের এই-সব কথা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে বলতে একটুও লজ্জা করে না।

এই নিয়ে ওদের প্রায়ই খুব তর্ক বেধে যায়। আমার বন্ধুটি—বন্ধু বলছি শুধু নাম জানিনে বলে,' এটা লোকটাকে বুঝাবার জন্যে একটা সংজ্ঞা বা চিহ্ন মাত্র, অন্য কিছু ভেব না যেন!—বন্ধুটি একেবারে জলে ক্ষেপে উঠে খুব জোর দিয়ে বলে—"মেয়েরা যদি বাইরে না বেরোয় ত মরুভূমিতে আর কতকাল চরা যাবে?" সে যে আমাকে শুনিয়েই কথাটা বলে তা আমি খুব বুঝি। আমি যেন তার কাছে স্ত্রী-স্বাধীনতার অগ্রদূত। বন্ধুর কথা শুনে তার বন্ধু একটি তরুণ সুকুমার যুবক একদিন বলে উঠল—"আমাদের লোককে বলবার কোনো অধিকার নেই। আমরা নিজেরা স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে কিছু কি করছি?" আমার বন্ধু অমনি বলে উঠল—"আরে এখন করব কি? আগে স্ত্রী হোক তারপর ত স্বাধীনতা দেবো! বিয়ে হোক আগে, তখন দেখবে আমাদের দৃষ্টান্তে পঁচিশ বছরের মধ্যে

পথঘাট সুন্দরীতে ছেয়ে যাবে !" বোঝা গেল বন্ধুর বিয়ে হয়নি। সুন্দর যুবাটি বলে উঠল—"আরে পঁচিশ বছর পরে যখন চোখে ছানি পড়ে যাবে তখন সুন্দরীতে পথ ছাইলেই বা আমাদের কি !" তখন ব্যাপারটাকে চট-পট আগিয়ে আন্‌বার পরামর্শ চলতে লাগল। সেই সুন্দর যুবাটি বল্লে—"এস এক কাজ করা যাক। রবিবাবুর 'আমরা ও তোমরা' গানটা গেয়ে নগরসঙ্কীর্ত্তনে বেরিয়ে পড়া যাক ! সুন্দরীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্ত্তনাদ করে বলা যাক্—

'তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো সুলগনে হব নাকি কাছাকাছি !'

মেয়েদের একবার বিদ্রোহী করে' তুলতে পারলে একদিনে সব অবরোধ ভেঙে চূরমার করে দেওয়া যাবে !" বন্ধু বললে—"বিদ্রোহ করবে মেয়েরা ? পুরুষদেরই বড় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আছে, তা আবার মেয়েদের !"

পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের ছোট করে' দেখার ভাবটা আমার ভালো লাগল না। এর জন্যে আমরাই অনেক-খানি দায়ী। আমরা পুরুষের সমকক্ষ হতে কি চেষ্টা

করেছি ? যা আমাদের হক্, তা আমরা দাবী করে আদায় করতে কি জানি ? আমরা অবলা, পিঁজরের পাখী !

আমাদের পরে যে-সমস্ত মেয়ে অবরোধের বাইরে বেরিয়ে স্বাধীন হবে, তাদের অবস্থাটা আমরা অনেক সহজ ও নিষ্কণ্টক করে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কণ্টকবেধের বেদনা আমাদের সর্ব্বাঙ্গে দারুণ লজ্জার লালিমায় ফুটে ফুটে উঠছে ! অগ্রদূতের ভাগ্যই এই রকম, দুঃখ করা বৃথা !

আজ তবে আসি ভাই, পত্র বিরাট ও ডাকের সময় নিকট হয়ে এল। ইতি—

তোমার স্নেহাসক্ত লাবণ্য।

২

ভাই লাবণ্য,

তোর মজার চিঠি পড়ে' আমি এমন হেসেছি যে তোর পিতৃবিয়োগের দুঃখটা অনুভব করবার অবসরই পাইনি। তুই পুরুষদের যে চিত্র এঁকেছিস সেটা এমন মজার হয়েছে যে পুরুষগুলোকে না পড়াতে পারলে আমার

তৃপ্তি হচ্ছে না। মনে কর্‌ছি চিঠিখানা নকল করে' প্রবাসীতে পাঠিয়ে দেবো—তোর বন্ধুর সাহিত্যিক দল দুনিয়ার লোকের নিরিখ পরখ করে' ফেরেন, তাদের নিজেদেরও নিরিখটার পরখ হয়ে যাওয়া ভাল।

তুই অবলা মানুষ, পুরুষের ভিড়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া কি তোকে সাজে? এক কাজ কর না, তোর বন্ধুর শরণাপন্ন হ না। তোরও ভালো লেগেছে তাকে, তারও ভালো লেগেছে তোকে; তোদের বিয়েও এক একটা করতে হবে; তবে না হয় শুভ কার্য্যটা তোরা দুজনেই সেরে নিলি। একটু সাহস করে' আলাপটা করে ফ্যাল্! বলে' দিচ্ছি দেখে নিস্, তোর বন্ধু মোটেই গররাজী হবে না। কথায় বলে না যে, 'ক্যাঙলা ভাত খাবি?' ক্যাঙলা বলে 'পাতা পাতব কোথায়?' তোর বন্ধু ত পাতা পাতবার জন্তে প্রস্তুত হয়েই আছে, তুই একবার ভাত খাবে কি না, জিজ্ঞাসা করলেই হয়। এই পত্রের উত্তরে সুখবর শোনবার প্রত্যাশায় রইলুম। ইতি—

তোর ললিতা।

৩

ভাই ললিতা,

তোর উপদেশ পাবার আগেই আমার বন্ধুর সঙ্গে এক-দিন দৈবগতিকে আলাপ হয়ে গেছে। কি ভাই বেহায়া লোক, ছি!

একদিন আমি টিকিট-ঘরে বসে আমার সহকর্ম্মী আর-একজন মেয়ের সঙ্গে গল্প কর্‌ছি, এমন সময় ঘুলঘুলি দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটি টাকা দুই আঙুলে ধরে' কে একজন বলে উঠল—"আমায় একখানা দমদমার টিকিট দিন ত।" সেই স্বর শুনে চমকে উঠে যেমন সেই দিকে তাকিয়েছি অমনি দেখি ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে সে-ই উঁকি মেরে হাসছে। আমাকে ফিরতে দেখেই কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে' অন্য দশজন লোকের সামনেই জিজ্ঞাসা করে বসল—"আপনি কি এখানে কাজ করেন?" দেখেছ কি রকম দুষ্টবুদ্ধি! কেবল ইচ্ছে করে' আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলা! দেখছ ত আমি টিকিট-ঘরে রয়েছি, সেখানে কাজ করতে না ত কি নেমন্তন্ন খেতে গেছি? এ যেন সেই রকম কাষ্ঠ লৌকিকতা—তেলমেখে ঘাটে আছে দেখেও লোকে

জিজ্ঞাসা করবে, নাইতে এসেছ? কিম্বা বাজারে মাছ তরকারী কিনছে দেখেও জিজ্ঞাসা করবে, বাজার করতে এসেছ? যদি সন্দেহ থাকে, হয় চশমা নেও গিয়ে, নয় বুদ্ধি বাড়াবার জন্যে কবিরাজের ব্রাহ্মী ঘৃত খাও গিয়ে, অমন বোকার মতো প্রশ্ন করে' লোক হাসিয়ো না। ও যখন আমায় জিজ্ঞাসা করলে "আপনি এখানে কাজ করেন?" তখন সত্যি ভাই, লজ্জায় আমার মাথাটা যেন কাটা গেল। আমি এই সামান্য কাজ করি এ ত নিত্য হাজারো পুরুষ দেখে যাচ্ছে, কিন্তু ও দেখলে বলে' আমার অমন লজ্জা হল কেন কি জানি। আমি যে লেখাপড়া জানি, গাইতে ও বাজাতেও পারি, জগৎব্যাপারের হাল নাগাদ খোঁজ রাখি, তাকে এ কথা জানাবার অবসর ঘটল না; অবসর ঘটল কিনা তার দেখে যাবার যে আমি ষ্টেসনে যত রাজ্যের র‍্যাজলা লোককে টিকিট বেচি! আমি লজ্জায় জড়সড় হয়ে মুখ লাল করে' শুধু বলতে পারলাম "হ্যাঁ।" এই আমাদের প্রথম কথা কওয়া।

এর পর থেকে ভাই, ওর প্রায়ই দমদমায় যাওয়া দরকার হয়ে উঠল। দমদমায় যাওয়া ত নয়, দমবাজি। টিকিট

নিতে এসে কত যে অনাবশ্যক প্রশ্ন করে তার আর ঠিক-ঠিকানা নেই। নাইনটিন ডাউন পেসেঞ্জার কোন্ প্লাটফরমে আসবে, সেভেন আপ্ ক'টার সময় ছাড়বে—ব্যারাক-পুরের রিটার্ণ টিকিটের দাম কত, উঈক-এণ্ড টিকিটে মঙ্গলবারে ফেরা যায় কি না,—এমনি সব অকেজো প্রশ্ন। এমন গুছিয়ে প্রশ্নটি করে যে এক কথায় উত্তর দেওয়া যায় না, আমায় বকিয়ে বকিয়ে মারে। কিন্তু কি যে বলছি তাই কি ছাই মন দিয়ে শোনে? হাঁ করে আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে। লোকে যে লক্ষ্য করচে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। কি বেহায়া লোক ভাই!

পূজোর ছুটি হয়ে গেছে। আপিস আদালত বন্ধ। কলকাতা ভোঁ-ভোঁ! সবাই ছুটি উপভোগ করছে, আমার কিন্তু নিত্য হাজরি দিতে যেতে হয়। সে লোকটির সঙ্গে আর দেখা হয় না—ট্রামেও না, দমদমাও যায় না। আপিস না হয় বন্ধ, দমদমা ত বন্ধ নয়, মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতে কে মানা করে? পুরুষ মানুষ কিনা, বাইরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে এমন অরুচি হয়ে যায় যে ছুটি পেলেই ঘরের কোণ

আঁকড়ে পড়ে থাকে। আমরা হলে ছুটির দিনেই বেশী করে বেড়াতে যেতুম।

সেদিন একে ছুটি, তায় রবিবার, তায় দুপুর বেলা। ট্রামে জনমানব নেই। কেবল এক কামরায় দেখি শ্যাম-সুন্দর বসে আছেন। আমাকে দেখেই এক গাল হেসে ফেল্‌লে। আচ্ছা, হাসলে কি বলে' ভাই একজন অচেনা মেয়েকে দেখে?—ওর হাসি দেখে আমিও হাসি সামলাতে পার্‌লুম না। ভারি বদ লোক ও, অমন করে পথে ঘাটে মেয়ে মানুষকে হাসানো কি উচিত? আমি ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে সারা গাড়ীটা খালি থাকতেও উঠে পড়লুম ওরই কামরাটাতে। গাড়ীতে উঠে পড়ে' আমার হুঁস হল। ভারি রাগ হল ঐ লোকটার ওপর! একবারটি আমায় বারণ করতে পারলে না! আমি না পারি তখন নামতে, আর না পারি বসতে। কট্‌মট্‌ করে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, আর ও কিনা দিব্যি বসে বসে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এমন সময় ট্রামটা চলতে সুরু করলে, আমি হুমড়ি খেয়ে একেবারে পড়ে গেলুম ঐ লোকটার গায়ে! ও অমনি খপ করে আমায় ধরে ফেললে।

আমি তাড়াতাড়ি ওর সামনেই বসে পড়লুম। ও কিন্তু তখনো আমার হাত ছাড়েনি—হাত ধরেই জিজ্ঞাসা করলে —"আপনার লাগেনি ত ?" আমার রাগে গা জলে গেল—আমার লাগুক না-লাগুক তোর অত মাথাব্যথা কেন ? আমি সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বল্লুম, "আপনার গায়ে পড়ে গেছি, মাপ করবেন।" বেহায়াটা বল্লে কিনা আমার মুখের ওপর "এ সৌভাগ্যের জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।" রাগের চোটে আমি একেবারে ভুলেই গেলুম যে আমার একখানা হাত বর্ব্বরটার দু হাতের মধ্যেই রয়ে গেছে। ওর কি আমায় মনে করিয়ে দেওয়া উচিত ছিল না। ও আমায় বলতে লাগল "দেখুন, আপনিও আমাকে অনেক দিন থেকে দেখছেন, আমিও দেখছি, অথচ দুজনের পরিচয় না হওয়াটা কি ভালো ? আমি আপনার পরিচয় সংগ্রহ করেছি—আপনার নাম লাবণ্য, নামটি আপনার রূপের উপযুক্ত বটে, রামমণি হলে মোটেই মানাত না। আপনাদের হরিশ পরামাণিকের গলিতে বাড়ী পর্য্যন্ত আমি দেখে এসেছি; লজঞ্জুষ দিয়ে আপনার বোন পুষি আর ভাই নকুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েও ফেলেছি। এখন আমার

পরিচয়টা আপনার জানা দরকার।” ওর পরিচয় জানবার জন্যে ত আমার ঘুম হচ্ছে না! আমি কিচ্ছু না বলে চুপ করে রইলুম, বকে মরছে বকুক, আমি ত আর শুনতে চাইনে। আমি শুনি আর না-শুনি সে সটান বলেই গেল —“আমার নাম দীনেশ, বাড়ী কাঁসারীপাড়ায়, শালবনি টি ষ্টেটের কলকাতার আপিসের ম্যানেজারের কাজ করি, মাইনে পাই মোটে আড়াই শ টাকা। বাড়ীতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই; চাকর বামুনের অনুগ্রহে নির্ভর করে কোনো রকমে বেঁচে আছি। আমি খুঁজছিলুম যদি তেমন একজন মনের মতন লোক পাই যে আমার এই অগোছালো জীবনটার একটা বিলি ব্যবস্থা করে দিতে পারে। মাপ করবেন আমার ধৃষ্টতা, আপনাকে বলতে কুন্ঠিত হচ্ছি, আপনি যদি কিছু না মনে করেন তবে দয়া করে আমার গৃহস্থালির ম্যানেজারীটা নিয়ে আমার একটা উপায় করলে আমি বেঁচে যাই।” কথা শুনে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল—আমি কি ওর কাছে চাকরীর উমেদারী করতে গিছলুম যে ও আমায় চাকরী দিতে চায়!

আমি মাথা নীচু করে চুপ করে বসে রইলুম, হাঁ কি না কিছুই বলতে পারলুম না।

লোকটা ভাই ভয়ানক নাছোড়বান্দা রকমে ধরে বসেছে, যে, তার একটা বিলি ব্যবস্থা আমায় করে' দিতেই হবে। মাও তারি পক্ষে। পুষি আর নকুরও খুব তাগাদা দেখছি—নিশ্চয় লজঞ্চুষের ঘুষের খাতিরে! আমি ভাই একেবারে নাচার হয়ে পড়েছি। আমার কিছুমাত্র আগ্রহ আছে মনেও ভেবো না। পাঁচজনের অনুরোধে মানুষ এমন বিপদেও পড়ে!

পোষা পাখী উড়ে গেলে খাঁচা দেখালেই আবার ফিরে এসে খাঁচায় ঢোকে। সে বুঝতেই পারে না খাঁচার বাইরে স্বাধীনতার আনন্দই ভালো, না খাঁচার মধ্যে নিশ্চিন্ত দানাপানির ব্যবস্থাটাই আরামের। পিঞ্জরে-ভাঙা পাখীর গতি কি, বল ত ভাই! ইতি—

তোমার লাবণ্য।

শ্রীমতীবনলতা দেবী প্রণীত

Approved as a prize book for girls in School & prize & Library books for Schools in Bengal, No 3766 G / 2 B 3/84 S 24

লক্ষ্মীশ্রী

১৩৪২ সালে ৫ম সংস্করণ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশিত হইল কিন্তু মূল্য বাড়িল না। পুস্তকখানি অনিন্দ্য-সুন্দর তক্-তকে ঝক্ ঝকে। অত্যন্ত কার্য্যকরী উপহার গ্রন্থ। বাজে বই নয়।

এই পুস্তকখানি প্রত্যেক কুল-মহিলার পক্ষে কিরূপ অত্যাবশ্যকীয় তাহা সামান্য বিজ্ঞাপনের দ্বারা বুঝানো অসম্ভব! সামান্য অন্ন-রন্ধন হইতে পোলাও, কালিয়া, মাংস, পিষ্টক, সন্দেশ, মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী আধুনিক ধরণে বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিয়া খুব সহজ ভাবে লিখিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার দেশী ও বিলাতী রন্ধন প্রচলিত হইয়াছে তাহার প্রয়োজনীয় সমস্তই ইহাতে সহজ ভাষায় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা দেখিলেই পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন!

সহজ অন্ন-রন্ধন-প্রণালী, ঘৃত অন্ন, হল্‌দে ভাত, মিষ্ট-অন্ন, খিচুড়ী প্রস্তুতকরণ, ভুনি,খিচুড়ী,ভাজা ভাত, শাকের ঘণ্ট মোচার ঘণ্ট কড়াইশুটীর ঘণ্ট, শুক্তা, মুগের ডাউল প্রস্তুত প্রণালী, শুলের ডাল্লা, ইচড় বা কাঁটালের ডাল্লা, কাঁটালের চপ ও কাটলেট,নিমের ঝোল, কাঁচা পেঁপের ডাল্লা, বাঁশের কোঁড়ার ডাল্লা, বাঁধাকপির ডাল্লা, ছানারডাল্লা, ফুলকপির ডাল্লা, করোলার দোলমা, পটলের দোল্‌মা, কড়াইশুটীর ডাল্লা, বাঁধাকপি ও দুধের পায়স ও বাব্‌ড়ি, ওলভাজা, নিরামিষ অম্ল, খেজুর রসের অম্ল, নলেন গুড় ও বাতাসার পায়েস, মৎস্য ও মাংস রন্ধন-প্রণালী, মাছের বড়া, মুড়ীর ঘণ্ট, মাছের ঘণ্ট, বাঁধাকপির সহিত কৈমাছের তরকারি, রুই মাছের প্রলেহ মাছের ঝোল ও মাছের ভর্ত্তা, ওলকপির সহিত চিংড়ি মাছের প্রলেহ বাঁধাকপির সহিত কৈমাছের ব্যঞ্জন, নানাপ্রকারের মাছ পোড়া ও ভাতে

মাছ সিদ্ধ ; দৈ মাছ, কুমড়ার নানাবিধ পায়স, কাঁচা (অপক্ক) কলার রুটি, মানের রুটীও পায়স, চিংড়িমাছের কাট্‌লেট চিংড়ীমাছ পোড়া, ইলিশমাছ ভাতে ও সিদ্ধ, মাছের কোপ্তা, মাছের দম নিরামিষ পোলাও, ছানার দধি পলান্ন, পোঁলাও, আনারসের পোলাও, ফুলকপির পোলাও, মাছের পোলাও, মাংসের পোলাও, চিতলমাছের কোপ্তা, মাছের পুরী, মাছের ঝুরিভাজা, গল্‌দাচিংড়ির রসবড়া, চিংড়িমাছের সহিত বুটের ডাল, তেল ঝোল, ছেঁচড়া, ডিমের প্রলেহ, ডিমের মলিদা, ডিমের মোহনভোগ, ডিম্বামৃত, ডিমের কাটলেট, ডিমের বড়া, ডিমের পুরী ও ডিমের মধুরাম্ল, মাংস প্রকরণ, পাঁটার কারি বা ঝোল, মাংসের ভর্ত্তা, মাংসের কোপ্তা ও মাংসের অম্ল, মাংসের কাটলেট ও চপ, মাংসের রোষ্ট, মাংসের গেরেল, আনারসের চাটনি, আলুর চাটনি, পুদিনা শাকের চাটনি, আলুবখরার চাটনি, পায়স, ফুলকো লুচি, খাস্তার লুচি, ও কচুরি, বড় কচুরি ও সিঙ্গেড়া প্রস্তুতপ্রণালী, পাঁপর ভাজিবার প্রণালী, ও ঝালবড়া প্রস্তুত, নিম্‌কি, পাটনাই নিম্‌কি গজা ও বালুসাই প্রস্তুতপ্রণালী, বঁদে ও মিঠাই প্রস্তুত, মিহিদানা, জিলাপী, অমৃতি, ছানাবড়া, ছানার মালপোয়া ও রসমাধুরী প্রস্তুত প্রণালী, নিখুঁতি করণ, খাজা প্রস্তুত-প্রণালী, মুগের বরফি, গোলাপী চন্দ্রপুলী, মাড়োয়ারী হালুয়া, কমলালেবুর বরফি, ক্ষীরের গুজিয়া, ক্ষীরের বরফি, গোলাপী চম্‌চম্‌, ক্ষীরের আপেল ক্ষীরের লুচি, চন্দ্রমাছ, চন্দ্রানন, খৈচুর, সরপুরিয়া, রসবড়া, রসগোল্লা ক্ষীরমোহন, লেডিক্যানি, চম্‌চম্‌ প্রস্তুতপ্রণালী, ক্ষীরের মনোরঞ্জন, ক্ষীরের ছাঁচ, তাল ক্ষীর, বরফি, গোলাপী রসগোল্লা, পাকা আমের বঁদে ও কুমড়ার মেঠাই, সীতাভোগ, ছানার মুড়কি ও ছানার পায়স ছানার মালপোয়া, কিস্‌মিসের মোহন ভোগ, রাবড়ী, খাসা মোণ্ডা, ও কস্তুরো সন্দেশ, নূতন গুড়ের সন্দেশ, তালশাঁস সন্দেশ, আম সন্দেশ, সর চূর্ণ, ক্ষীরের পানতুয়া, পেস্তার বরফি, খেজুর রসের পায়স ও বঁদের পায়স, মানকচুর রুটী ও পায়স, চিড়ার পিঠা, ভাজা মুগের বরফি ও পিঠা, গোকুল পিঠা এবং কলার পিঠা, গোপালভোগ পিঠা, পরিশিষ্ট মোরব্বা, নানাবিধ জেম জেলী, চাট্‌নী, সাগু এরারোট ও মানমণ্ড, খৈ ও যবের মণ্ড ও সুজির রুটী, মাংসের জুস, কুলের আচার ও বেগুনের আচার, তেঁতুল, কুল, আমড়া, লেবু আদা প্রভৃতির আচার ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রাণনাথ মল্লিক ও ব্রাহ্ম-সমাজ

শ্রীমতী বনলতা দেবী তদীয়া দাদাশ্বশুরের এই জীবনচরিতখানি লিখিয়া দেশের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় ১০০ বৎসরের পূর্ব্বকার ব্রাহ্ম-সমাজের ও ব্রাহ্মদিগের বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা ৫০ বছর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার ছিল কিম্বা আর কিছুকাল পরে সংগ্রহ করা সম্পূর্ণই অসম্ভব হয় ত হইয়া পড়িত। "প্রাণনাথ মল্লিকের চেষ্টা যত্ন ও উদ্যোগে ইঁহার জ্ঞাতি ও স্বজন মিলিয়া প্রায় ১০০ ঘর বাগআঁচড়া নিবাসী ব্রাহ্মণ, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।" তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের যে মহান্ উপকার ও পুষ্টিসাধন হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে ব্রাহ্ম-সমাজে উপনয়ন সংস্কার ও জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান ছিল। ৺প্রাণনাথ মল্লিকই ব্রাহ্মদিগের উপবীত ত্যাগের ও বেদীতে বসিয়া অব্রাহ্মণের পক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করার অধিকার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে আন্দোলন ও বিপ্লব আনয়ন করেন। স্ত্রীস্বাধীনতা ও ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগদান এবং প্রকাশ্যে চলাফেরা তাঁর বাটীর মেয়েরাই সর্ব্বপ্রথম করেন। স্ত্রী-স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক তিনিই। প্রবর্ত্তকে এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল অষ্টমবর্ষ ২য় সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠা ও ৪র্থ সংখ্যা ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :—"বাগআঁচড়া হইতেই ব্রাহ্মসমাজে প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। * * * প্রাণনাথ মল্লিক একজন অগ্রণী ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি কহিলেন 'উপবীত রাখা কপটতার চিহ্ন ও মহাপাপ * * * কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও বেচারাম বাবু উপবীত পরিত্যাগ না করিয়া বেদীর কার্য্য করেন কেন?" * * * কথাটা গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাইয়া আঘাত করিল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যদি ব্রাহ্মসমাজের এই কুরীতি, সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে যে সমাজ অসত্যের প্রশ্রয় দেয় তাহার সহিত যোগ দিব না।" ইহার পরই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় উপবীত ত্যাগ করিলেন। উপবীতধারী আচার্য্যের ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে ব্রহ্মোপাসনা বা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে অমনি তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সম্পাদক মহাশয়কে এই কথা লিখিয়া জানাইলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। এই প্রতিবাদ পত্রে গোঁসাই কেশবচন্দ্রকে ইহাও জানাইলেন যে, যদি কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্যগণ উপবীতধারী হন, তবে আমি অসত্যের আলয় বলিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিব।" কেশবচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিবাদ পত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে দিলেন। মহর্ষি গোস্বামী মহাশয়ের মতের অনুমোদন করিয়া * * * গোস্বামী মহাশয় এবং অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য মনোনীত হইলে সমাজের আচার্য্যগণের পক্ষে উপবীত ধারণ নিষিদ্ধ হইল।" (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনী, সদগুরুসঙ্গ, বিজয় কথামৃত প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)

এই বহিতে সেকালের বহু ঘটনার সঙ্গে প্রবীণ লেখক লেখিকাদের লিখিত অনেক লেখা যোগ করা হইয়াছে, যেমন :—প্রাণনাথ মল্লিকের পুত্র রজনীকান্ত মল্লিক সম্বন্ধে